দানপত্র

শ্রীজলধর সেন

ভাদ্র—১৩২৯

পাঁচ সিকা

প্রকাশক—শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রিণ্টার—শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী
কালিকা প্রেস
২১, নন্দকুমার চৌধুরীর ২য় লেন, কলিকাতা

স্নেহাস্পদ

শ্রীমান্ হরিদাস চট্টোপাধ্যায়

ও

শ্রীমান্ সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়-

করকমলেষু

ভাই হরি-সুধা,

এই নেও বৃদ্ধ দাদার শেষ 'দানপত্র'।

শ্রীজলধর

গ্রন্থকার প্রণীত অন্যান্য গ্রন্থ—

ভ্রমণ—হিমালয় ১।০, হিমাদ্রি ৷৵৹, প্রবাস চিত্র ১৲, পথিক ১৲, পুরাতন পঞ্জিকা ১৲, দশদিন ১।০।

উপন্যাস—ছোট কাকী ১৲, দুঃখিনী ॥৵০, বিশুদাদা ১॥০, সীতাদেবী ১৲, করিম সেখ ৷৹০, অভাগী ॥০, বড়বাড়ী ॥০, হরিশভাণ্ডারী ॥০, পাগল ১॥০, ষোল আনি ১॥০, ঈশানী ১॥০, চোখের জল ১॥০, অভাগী ২য় ভাগ ১৲।

জীবনী—কাঙ্গাল হরিনাথ ১ম ১।০, ঐ ২য় ১।০।

ছোট গল্প—নৈবেদ্য ॥০, নূতন গিন্নী ৷৹০, আমার ঘর ১।০, পরাণমণ্ডল ১।০, আশীর্ব্বাদ ১।০, এক পেয়ালা চা ১॥০, মায়ের-নাম ১॥০, কাঙ্গালের ঠাকুর ॥০, কিশোর ১।০, সাথী ।০।

প্রাপ্তিস্থান—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

দানপত্র

১

কোন্ স্থান থেকে আমার জীবনের কথা আরম্ভ করব, তাই ভেবে পাচ্ছিনে। জীবন-কথা বল্‌তে গেলে প্রথমেই আত্ম-পরিচয় দিতে হয়; বাপ-মায়ের নাম বল্‌তে হয়; জন্মের সাল তারিখ বল্‌তে হয়; বংশ-পরিচয় দিতে হয়। আমি এই এতগুলো বিবরণের মধ্যে কেবল একটী কথার উত্তর দিতে পারি। সেটী আমার মায়ের নাম। তাঁর নাম ছিল বিরাজমোহিনী। তিনি ব্রাহ্মণের মেয়ে ছিলেন, ব্রাহ্মণেরই পত্নী ছিলেন, এই মাত্র তাঁর মুখে শুনেছি। তিনি বেঁচে থাক্‌বার সময় একবার বাবার নাম জিজ্ঞাসা করেছিলাম; তিনি লিখে দিয়েছিলেন ৺সুধাময় মুখোপাধ্যায়। বুদ্ধি পড়ে অবধি মাকেই দেখেছি; বাবা কি অন্য কোন অভিভাবক দেখি নাই, কারও নামও

শুনি নাই। বাড়ী কলিকাতা ভৈরব চাটুয্যের লেনে—যে বাড়ীতে মা থাকতেন। বাবা যখন মুখোপাধ্যায়, তখন আমিও মুখোপাধ্যায়; আমার নাম শ্রীপ্রেমময় মুখোপাধ্যায়। মায়ের মৃত্যু-দিন পর্য্যন্ত আমার এই পরিচয় ছিল; তার পর সব উলট্-পালট্ হয়ে গিয়েছে;—সব মিথ্যে হয়ে গিয়েছে;—সত্যি যে কি, তার কোন সন্ধানই তখন মিলে নাই; সন্ধানের চেষ্টাও তখন করি নাই; মা সে পথে একেবারে কাঁটা দিয়ে গিয়েছিলেন।

মা যখন মারা যান, আমি তখন প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ হয়ে রিপন কলেজে ফার্ষ্ট ইয়ার আই-এ পড়ছিলাম। তখন আমার বয়স সতর বছর। আমাদের বাড়ীখানি মায়ের নামেই ছিল। খরচ চল্‌ত কেমন করে, তাও জানতাম। জোড়াবাগানের এক বড় বাঙ্গালী মহাজনের আড়তে মায়ের নামে কিছু টাকা জমা ছিল; মাসের প্রথমেই সেই আড়তের একজন লোক এসে স্থদের টাকা দিয়ে যেত। সে স্থদও বড় কম নয়—আশি টাকা। সেই আশি টাকায় আমাদের বেশ চলে যেত, কোন কষ্টই হতো না; আমি, শ্রীপ্রেমময় মুখোপাধ্যায় নাম ধারণ করে কলেজে পড়তাম, বেড়িয়ে বেড়াতাম, নিশ্চিন্ত মনে থাকতাম।

তার পর একদিন মায়ের জ্বর হোলো। জ্বর না জ্বর; মা বল্‌লেন, বামুনের মেয়ের আবার অসুখ কি? আমি কত বল্‌লাম, ডাক্তার ডাকি। মা কিছুতেই স্বীকার কর্‌লেন না। তিন দিনের দিন যখন

বড় বাড়াবাড়ি হোলো, মা অজ্ঞান হয়ে পড়লেন, তখন ডাক্তার ডেকে আনলাম। ডাক্তার মায়ের অবস্থা পরীক্ষা করে রেগে উঠে, দাঁত খিঁচিয়ে আমাকে বল্‌লেন, ষ্টুপিড বয়, একেবারে গঙ্গাযাত্রার সময় চিকিৎসার কথা মনে হয়েছে। আর ওষুধ দিয়ে কিছু হবে না; লোকজন ডেকে-ডুকে নিয়ে এস, আর বেশী দেরী নেই।' এই ব'লে চারটী টাকা নিয়ে প্রস্থান করলেন।

ডাক্তার চলে গেলে প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে মায়ের বেশ জ্ঞান ফিরে এল। তিনি অতি ধীরে ধীরে আমায় বল্‌লেন, প্রেম, আমি তোকে একেবারে ভাসিয়ে দিয়ে গেলাম। আমার আর সময় নেই। দেখ্, আমার সিন্দুকের মধ্যে একখানি কাগজ রইল, তাই পড়ে দেখ্‌লেই সব জান্‌তে পারবি। আমি নিজ হাতে সব লিখে রেখেছি। অভাব অনেক হবে বাবা, কিন্তু খাওয়া-পরার কষ্ট হবে না, তার ব্যবস্থা করে গিয়েছি। দেখ্ প্রেম, মর্‌বার সময় একটা কথা বলে যাই, একটা প্রার্থনা জানিয়ে যাই, তুই আমার সন্তান। তুই আমাকে ক্ষ—। কথাটা মা আর শেষ করতে পারলেন না; তাঁর দম আট্‌কে গেল; আমি কোন কথা বল্‌বার আগেই সব শেষ হয়ে গেল। মা কোথায় চলে গেলেন, তা ত বল্‌তে পারিনে!

পাড়ার অনেকের সঙ্গেই আমাদের ভাব ছিল, পরিচয়ও ছিল। এই বিপদ সময়ে সকলেই এলেন; মায়ের সৎকারের যা ব্যবস্থা করতে হয়, যাঁরা বিচক্ষণ, তাঁরাই তা করলেন। যথারীতি মায়ের সৎকার

করে কাচা গলায় দিয়ে শূন্য ঘরে ফিরে এলাম। সারারাত্রি জেগে বেলা নটার সময় বাড়ীতে এসে বড়ই ক্লান্ত হয়ে পড়লাম ; কিছুই ভাল লাগল্ না ; শুয়ে পড়লাম।

যখন ঘুম ভেঙ্গে গেল, তখন প্রায় সন্ধ্যা। অনেকদিনের পুরাণো ঝি একেলা বাড়ী আগ্‌লে বসে আছে।

আমার ঘুম ভেঙ্গেছে দেখে ঝি বল্‌ল, বাবা আজ ত আর হবিষ্যি নেই, একেবারে নির্জ্জলা উপোস কি দিতে পারবে? একটু গঙ্গাজল আর ফলমূল খাও ; আমি এনে দিই।

আমি বল্‌লাম, ফলমূলের দরকার নেই ঝি, একটু গঙ্গাজল দেও, আমার গলাটা শুকিয়ে গেছে।

ঝি বল্‌ল, আহা,—তা আর যাবে না ; গিন্নী থাক্‌লে তোমার যে এতক্ষণে পাঁচবার খাওয়া হোতো ; আমি গঙ্গাজল আন্‌ছি। এই বলে ঝি চলে গেল। একটু পরেই একটা ঘটিতে গঙ্গাজল এনে দিল ; আমি সেই এক ঘটি জল খেয়ে ফেল্‌লাম।

ঝি বল্‌ল, পাড়া থেকে দু একজনকে রাত্তিরে থাক্‌বার জন্য ডেকে আনিগে ; দু'চার দিন লোকজন না থাক্‌লে হবে না।

আমি বল্‌লাম, কেন, ভয় কি ঝি! আমি বেশ একেলা থাক্‌তে পারব। তোমার যদি ভয় করে, তা হলে তুমি এই ঘরেই শোবে।

ঝি বল্‌ল, আমার আবার ভয় কি? তুমি ছেলেমানুষ, তাই বল্‌ছি।

আমি বল্‌লাম, সে সবে দরকার নেই। তুমি সারাদিন উপোস করে আছ; কিছু খাবার ব্যবস্থা কর গে। পয়সা-কড়ি দেব?

ঝি বল্‌ল, আরে আমার অদেষ্ট, তুমি ছেলেমানুষ উপোস করে রইবে, আর আমি খাবো; এমন গয়লার মেয়ে পাও নি বাপ! আহা! গিন্নী আমায় কতই ভাল বাস্‌তেন। এই বলে ঝি কান্না সুরু করল। তার কান্না দেখে আমারও চোখে জল এল। সংসারে ছিলেন এক মা; আত্মীয়-স্বজন আর কারও সন্ধান জানিনে। সে মা-ও চলে গেলেন। এখন আমি একেবারে একা! কোথাও কেউ নেই!

হঠাৎ মনে পড়ল মায়ের অন্তিম কথা! তিনি সব লিখে রেখে গেছেন। কি লিখে রেখেছেন? লিখে রাখবার এমন কি থাক্‌তে পারে? তার পর যা বল্‌তে বল্‌তে আর বল্‌তে পার্‌লেন না, সে কথাটা ত 'ক্ষমা'! মা ছেলের কাছে মরবার সময় ক্ষমা চান, এ কি রকম কথা।

আর বিলম্ব করতে পারলাম না; সিন্দুকের চাবি আমার কাছেই ছিল। ঝি আলো জ্বেলে দিয়ে গেল। আমি সিন্দুক খুলে মায়ের লেখা কাগজখানি বার করলাম। শোন, সেই চিঠি!

২

বাবা প্রেমময়,

কেন তোর নাম প্রেমময় রেখেছিলাম, তা এই মরবার সময় বুঝতে পারছি। তোকে কোলে করে বুকের রক্ত দিয়ে মানুষ করেছি। তোর হৃদয়ের মহত্ত্ব আমি দেখ্‌তে পেয়েছি, তোর প্রেমময় নাম যে সার্থক হয়েছে তাও আমি বেশ জান্‌তে পেরেছি। তা যদি না পারতাম, তা হলে তোকে এমন ভাবে পত্র লিখ্‌তে পারতাম না, এমন করে আমার কলঙ্কিত জীবনের কথা মা হয়ে তোকে জানাতে চাইতাম না। তোর মধ্যে মহত্ত্ব দেখ্‌তে পেয়েই তোকে আমার জীবনের কথা বল্‌তে সাহসী হয়েছি। তুই যদি প্রেমময় না হতিস্, তুই যদি তোর জননীকে ক্ষমা করবার মত উচ্চ হৃদয়ের অধিকারী না হতিস্, তা হ'লে তোকে আমি অন্ধকারের মধ্যে, মিথ্যার জালের মধ্যেই আটক রেখে নরকে চলে যেতাম। তা আমি পারলাম না; মা হয়ে এমন কাজ করা আমার মত পাপীয়সীরও পক্ষে সম্ভবপর হোলো না। তাই তোর কাছে আমি অকপটে আমার অপবিত্র জীবনের সমস্ত কথা বল্‌তে বসেছি।

কথা সবই বল্‌ব বাপ! সুধু একটা বিষয় গোপন রাখব। আমার

পিতৃ-মাতৃকুল, আমার শ্বশুরকুল, এবং আরও একজনের পরিচয় আমি দিব না,—দেওয়া কর্ত্তব্য মনে করতে পারলাম না। কেন পারলাম না, সে কথা আমার কাহিনী বললেই তুমি বুঝতে পারবে। কি করব বাপ; তোমার বংশই নেই, তার আর পরিচয় কি? তোমাকে অপরিচিতই থাকতে হবে। কি করব, উপায় নেই। সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের বংশে জন্মগ্রহণ করে, তাঁদের কুলে যে কালী ঢেলে দিয়েছি, তা প্রকাশ করে, তাঁদের মর্য্যাদার হানি করতে আমার মন চাইল না। আর সে পরিচয় জেনেও তোমার কোন লাভই হবে না বাবা! তোমাকে তাঁরা কেউ গ্রহণ করতে যখন পারবেন না, তখন তাঁদের পরিচয়ে আর কাজ কি? এইটুকু গোপন রেখে, আর সব কথা তোমাকে বলছি। পুত্রের কাছে জননী তার কলুষিত জীবনের কথা বলতে বাধ্য হোলো, এ বড় কম প্রায়শ্চিত্ত নয়। জানি, এর চাইতেও বেশী দণ্ড আমার জন্য জমা আছে। তবুও এ দণ্ডও নিতান্ত সামান্য নয়।

তবে শোন, আমার কথা। তোমার নামের পিছনে যে 'মুখোপাধ্যায়' পদবী জুড়ে দিয়েছি, তাতে তোমার শাস্ত্রানুসারে অধিকার নাই। তুমি মুখোপাধ্যায় নও, বা অন্য কোন পদবীরও অধিকারী নও। আমি ব্রাহ্মণের কন্যা ছিলাম; তোমার জন্মদাতা যিনি, তিনিও ব্রাহ্মণ ছিলেন; কিন্তু তুমি সামাজিক হিসাবে ব্রাহ্মণ কি না, তা আমি বলতে পারিনে। আমি বেশী লেখাপড়া শিখিনি; শাস্ত্রের

কথাও বল্‌তে পারিনে ; তবে মোটামুটি যা আমার মনে হয়, তাতে বল্‌তে পারি, শাস্ত্র যা বলে বলুক, আমি তোমাকে—; না, না, সে কথা আমি বল্‌ব না ; তুমিই তার বিচার করো, তোমার উপরই সে ভার দিলাম।

কলিকাতার নিকটে একটী সহরে আমার বাপের বাড়ী। আমি বাবার কনিষ্ঠা কন্যা ; আমার বড় দুইটী ভাই ও একটী ভগিনী এখনও বেঁচে আছেন ; আমি কিন্তু তাঁদের কাছে সত্যসত্যই মৃত। তাঁরা জানেন, আমি আর ইহজগতে নাই। কথাটা ক্রমে ক্রমে বল্‌ছি, তা হলেই সব বুঝতে পারবে। আমার বাপের অবস্থা খুব ভাল ছিল। তিনি জমিদার ছিলেন, টাকাকড়িও যথেষ্ট ছিল ; বাড়ী ঘর দুয়ার সবই বড় মানুষের মত। এখনও তেমনই আছে শুন্‌তে পাই ; দেখা আর অদৃষ্টে হোল না। আমার দুই ভাই এখন দেশের মধ্যে খুব পদস্থ লোক। এই কলিকাতা সহরেও সম্ভ্রান্ত-বংশীয় বলিয়া তাঁহারা বিশেষ সম্মানিত ; বিদ্যাবুদ্ধি, ধনবল কিছুতেই তাঁহারা কম নহেন। আমার দিদির বিবাহও এই কলিকাতার নিকটেই গঙ্গার ধারে একটা বড় গ্রামে হইয়াছে। আমার ভগিনীপতির অবস্থা আমার বাপ-ভাইয়ের অবস্থা অপেক্ষা অনেক গুণে ভাল। তিনি একজন প্রসিদ্ধ ধনী, জমিদার এবং দেশ-বিখ্যাত ব্যক্তি। লেখাপড়া খুব ভাল জানেন ; সব কয়টা পাশ করিয়াছেন ! সরকার হইতে কোন উপাধি না পাইলেও তিনি গবর্ণ-মেণ্টের কাছেও খুব সম্মানিত ব্যক্তি ; দেশের লোকও তাঁহাকে পরম সদাশয় ধার্ম্মিক ব্যক্তি বলিয়াই শ্রদ্ধা করিয়া থাকে।

বড়মানুষের মেয়ে, লেখাপড়াও একরকম শিখিয়াছিলাম ; ইংরাজীও একটু-আদটুকু জানিতাম ; এখন ভুলিয়া গিয়াছি। বাবা মেম রাখিয়া আমাদের শিল্পকার্য্য শিখাইয়াছিলেন ; অর্থাৎ বড়মানুষের ঘরের মেয়েরা যেমন ভাবে লালিত-পালিত হয়, যেমন বিলাসের মধ্যে বর্দ্ধিত হয়, আমরা দুই বোনেই সেই রকম শিক্ষা-দীক্ষা পাইয়াছিলাম।

দিদির স্বামীর কথা বলিয়াছি। আমার বিবাহের কথা এখন বলি। বাবা আমার বিবাহের জন্য, আমার যখন বার বৎসর বয়স, তখন হইতেই খোঁজ আরম্ভ করেন। তাঁহার মনের মত বর আর কিছুতেই মেলে না। গরিবের ঘরে তিনি মেয়ে দেবেন না ; বড়মানুষের ছেলে চাই, অথচ সে ছেলে বিদ্বান হইবে, সুবোধ ও সচ্চরিত্র হইবে। বড়-দিদির অদৃষ্টে বড়মানুষ ও বিদ্বান বর যখন জুটিয়াছিল, তখন আমার অদৃষ্টেই বা জুটিবে না কেন ? বাবা চেষ্টা করিতে লাগিলেন, এদিকে আমারও বয়স বাড়ীতে লাগিল। আমার মা একেবারে চারিদিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। গরিবের ঘরে হইলে ১৬ বছরের কুমারী কন্যার জন্য সে সময় বাপ-মাকে বিশেষ গঞ্জনা-লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হইত। কিন্তু আমরা বড়মানুষ, কাজেই সামাজিক নির্য্যাতন কিছুই হইতে পারিল না। তবুও মা নিতান্ত অধীরা হইয়া পড়িলেন। বাবা তখন অন্যোপায় হইয়া তাঁহার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ত্যাগ করিলেন ; সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বর আর তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যার অদৃষ্টে জুটিল না। অনেক অনুসন্ধানের যাহা ফল হয়, ঠিক তাহাই হইল। আমার সহিত যাঁহার বিবাহ হইল,

তিনি এই কলিকাতা সহরেরই একটী বড়মানুষের ছেলে—বড় ব্যবসায়ীর পুত্র। আমার শ্বশুরের আয়, আমার যখন বিবাহ হয়, তখন না কি বৎসরে তিন চার লাখ টাকা ছিল। এখন কিন্তু তার কিছুই নাই; আমার শ্বশুরের ছেলেরা এখন পথের ভিখারী বলিলেই হয়।

এই বড়মানুষের ছেলের সঙ্গেই আমার বিবাহ হইল; অথবা স্পষ্ট করিয়াই বলি, বিবাহ যাহাকে বলে তাহা হইল না, বিবাহের অনুষ্ঠান হইল। বাবা ধনী, বিদ্বান, সুবোধ, সচ্চরিত্র জামাই খুজিয়াছিলেন; পাইলেন সুধু ধনী জামাই বা ধনী পিতার ছেলে; আর কিছুই পাইলেন না। আমার বাবা তাঁহার এই জামাইএর লেখাপড়া-জ্ঞান বা স্বভাব-চরিত্রের বিষয় হয় অনুসন্ধান কবেন নাই, আর না হয় তিনি প্রতারিত হইয়াছিলেন।

বিবাহের পরদিন শ্বশুরবাড়ী গিয়াই আমি সব কথা জানিতে পারিয়াছিলাম। আমার শ্বশুরবাড়ীর একটী ঝি আমার সম্মুখেই আমার সঙ্গের ঝিয়ের কাছে দুঃখ করিয়া বলিয়াছিল, হায় হায়, এমন লক্ষ্মী, এমন পরমা সুন্দরী মেয়েকে তোমার মনিব কেমন করে জলে ফেলে দিলেন, বল দেখি? অনেক ছেলে দেখেছি, এমন লক্ষ্মীছাড়া, এমন পাজী ছেলে কখন দেখিনি। সত্যি কথা বলব, তা হোক্ না মনিব। আহা! বউটিকে দেখে বড় মায়া হচ্চে। অদেষ্টে অনেক দুঃখ আছে দিদি! বলিয়া ঝি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল। আমার ঝি তখন বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, হ্যাঁ দিদি, আমা-

দের জামাইবাবু কি নেশা করেন? ঝি কপালে করাঘাত করিয়া বলিল, নেশা! নেশা কি একটা। এই কুড়ি বাইশ বছর বয়স; এরই মধ্যে নেশার আর কিছু বাকী নেই; আর স্বভাব-চরিত্তির, তা আর বলে কি হবে? কোন দিন রাত্তিরে বাড়ীতে দেখিনি; কোথায় মদ খেয়ে রাত কাটায়। জেনে-শুনে যে কেউ এমন ছেলের হাতে মেয়ে দেবে, এ আর জানতাম না বোন! হায় রে টাকা! টাকা ধুয়ে জল খেলেই স্বর্গ লাভ হোলো আর কি! অদেষ্ট দিদি, অদেষ্ট! নইলে এমন সোণারচাঁদ মেয়ে কি এমন হাতে পড়ে। এই দেখ না, আজ সবে বিয়ে করে এলি; আজই না হয় বাড়ীতে থাক; তা নয়, এসেই বেরিয়েছে। যদি বা আজ দয়া করে রাত্তিরে ফেরে, তখন দেখতে পাবে একেবারে অজ্ঞান!

ঝি অত কি বোঝে; সে আমার সম্মুখেই আমার যিনি স্বামী হইয়াছেন, তাঁহার গুণের কথা অম্লান-বদনে বলিয়া গেল। তাহার কথা শুনিয়া আমার মনে স্বামীর উপর ভয়ানক বিতৃষ্ণা জন্মিল। আমি সেই রাত্রিতেই মনে মনে ভগবানকে সাক্ষী করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলাম, এই অসচ্চরিত্র, মদ্যপ যুবককে আমি কিছুতেই স্বামী বলিয়া গ্রহণ করিব না; তাহার সহিত কোন সংশ্রব রাখিব না। সে যদি আমার উপর অত্যাচার করিতে আসে, তাহা হইলে প্রাণপণে বাধা দিব, আত্মহত্যা করিয়া তাহার হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিব। আমার তখন একবার মনে হইল, সেই রাত্রিতেই স্বামীগৃহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাই। কিন্তু শেষে

সে সঙ্কল্প ত্যাগ করিলাম। এই বাড়ীতেই থাকিব, বাড়ীর সকলের আজ্ঞাবহ হইব, দাসীর মত আর সকলের সেবা করিব। এই কর্ত্তব্য আমি মাথায় তুলিয়া লইলাম। কিন্তু, কোন দিন স্বামীর সংস্পর্শে আসিব না,—কিছুতেই না।

আমার এ প্রতিজ্ঞা আমি পালন করিয়াছিলাম। ফুলশয্যার রাত্রিতে যে সমস্ত আচার-অনুষ্ঠান হয়, তাহা হইয়া গেলে, আমি মিথ্যা করিয়া হাত-পা ছুড়িতে লাগিলাম। সকলে মনে করিল আমার হিষ্টি-রিয়ার ব্যারাম আছে। তাহারা আমাকে গৃহান্তরে লইয়া গেল। ফুল-শয্যার রাত্রিতে স্বামীর শয্যাভাগিনী হইতে না হয়, তাহারই জন্য এ প্রবঞ্চনা আমাকে করিতে হইয়াছিল।

তাহার পর আমার স্বামী মাত্র তিন বৎসর বাচিয়া ছিল। এ তিন বৎসরের মধ্যে আমি কোন দিন তাহার সেবা করি নাই, কোন দিন তাহার শয্যায় স্থান গ্রহণ করি নাই। ইহার জন্য আমাকে যে কত অত্যাচার, কত নির্য্যাতন ভোগ করিতে হইয়াছে, তাহা আর কি বলিব। মাতাল হইয়া ঘরে আসিয়া কত দিন আমার স্বামী আমাকে প্রহার করিয়াছে, আমার দেহ ক্ষতবিক্ষত করিয়া দিয়াছে; আমি সে সমস্তই নীরবে সহ্য করিয়াছি; তবুও তাহার পাশব-বৃত্তি চরিতার্থ করিতে দিই নাই,—আমি আমার দেহ দান করি নাই। ইহার জন্য বাড়ীতেই কি কম লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সহ্য করিয়াছি। বিবাহিতা হইয়াও আমি তিন বৎসর, সুদীর্ঘ তিন বৎসর কুমারী-জীবন যাপন করিয়াছিলাম। প্রতিজ্ঞা

করিয়াছিলাম এই ভাবেই জীবন কাটাইব। ব্রহ্মচারিণী ভাবে জীবন অতিবাহিত করিবার জন্য আমি সমস্ত বিলাস পরিত্যাগ করিয়াছিলাম; সামান্য অশন-বসনে দিন কাটাইতাম; দাসীর মত বাড়ীর সকলের সেবা করিতাম; সে কর্ত্তব্যের ক্রটী কেহ কোন দিন ধরিতে পারে নাই।

স্বামী বোধ হয় কিছুদিনের মধ্যেই বুঝিতে পারিল, অত্যাচার-নির্য্যাতন প্রভৃতিতে কোন ফলই হইবে না; আমাকে কিছুতেই টলাইতে পারিবে না; তখন তাহার নেশার মাত্রা আরও বাড়িয়া গেল। পূর্ব্বে মধ্যে-মধ্যে দুই চারি দিন মাতাল অবস্থায় বাড়ী ফিরিত; শেষে তাহাও ছাড়িয়া দিল। এ সকলের খরচ কোথা হইতে আসিত বলিতে পারি না,—বোধ হয় আমার শাশুড়ীই যোগাইতেন।

এই সময় আমার শ্বশুর মারা গেলেন। তখন আর পায় কে? তিন ভাই পিতার মৃত্যুর মাস তিনেক পরেই পৃথক হইলেন। আমার স্বামীর আর পৃথকই বা কি, একসঙ্গেই বা কি! তবে পিতার সম্পত্তির অংশ পাইয়া তাহার স্ফুর্ত্তির মাত্রা বাড়িয়া গেল। আমি যে বাড়ীতে আছি, শেষে সে কথাও সে ভুলিয়া গেল; আমি আমার বড় যায়ের সংসারভুক্ত হইলাম; তিনি আমাকে বড়ই ভাল বাসিতেন।

মাস তিনেক পরেই শুনিলাম, আমার স্বামী দেশভ্রমণে চলিয়া গিয়াছে। সঙ্গী কে বা কাহারা ছিল, সে সন্ধান লইবার কোন প্রয়োজনই বোধ করিলাম না;—যাহারা এতদিন সঙ্গী ছিল, তাহারই সঙ্গী হইয়াছিল, পরে তাহা জানিতে পারিয়াছিলাম।

আট নয় মাস পরে লক্ষ্ণৌ হইতে আমার বড় ভাসুরের নিকট তার আসিল যে, আমার স্বামী সেখানে মৃত্যুশয্যায়। শেষ সময়ে একবার সকলকে দেখিবার জন্য প্রার্থনা। এই তার পাইয়া আমার শাশুড়ী সেই দিনই লক্ষ্ণৌ যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। বড় বাবু বলিলেন, মা, বৌমাকেও লইয়া যাইতে হইবে। তারের খবরে ত সব কথা খুলিয়া বলিতে পারে নাই, সকলকে দেখিতে চায় বলিয়াছে; তার অর্থ তোমাকে আমাকে ত বটেই, বৌমাও আছেন।

শাশুড়ী আমার মত জিজ্ঞাসা করিলেন ;—আমার সহিত স্বামীর যে কি ভাব ছিল, তাহা ত সকলেই জানিতেন। একবার মনে করিলাম, যাইব না। কাহাকে দেখিতে যাইব ? কেন দেখিতে যাইব ? যাহাকে জীবনে স্বামী বলিয়া কোন গ্রহণ করি নাই, কোন দিন পূজা করি নাই, তাহার মরণকালে কি দেখিতে যাইব ? কি বলিতে যাইব ? বলিব কি, আমাকে ক্ষমা কর। কি অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিব ? কেন ? কিসের জন্য ? আমার হৃদয় বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। না, যাইব না,—কিছুতেই যাইব না। সে আমার কে যে, তাহাকে দেখিবার জন্য কষ্ট করিয়া লক্ষ্ণৌ পর্য্যন্ত ছুটিয়া যাইব।

সেই উত্তরই দিতে যাইতেছিলাম, সহসা কে যেন আমার মুখ চাপিয়া ধরিল। কে যেন আমাকে অমন রূঢ় উত্তর দিতে দিলে না। কে যেন হৃদয়ের মধ্য হইতে বলিয়া উঠিল, না, না, এমন কর্ম্ম করিস্ না। স্বামীর জন্য যাইতে বলিতেছি না ; যার সঙ্গে কোন সম্পর্ক নাই,

সেও যদি মৃত্যুকালে কাউকে দেখ্‌তে চায়, অতি বড় শত্রুকেও দেখ্‌তে চায়, তা হ'লেও যেতে হয়। এ মানুষের কর্ত্তব্য-কর্ম্ম!

আমার মন ফিরিয়া গেল,—আমি বলিলাম, মা, আমিও তোমাদের সঙ্গে যাব।

এ যে মানুষের প্রতি মানুষের কর্ত্তব্যের দোহাই! এ যে প্রাণের ভিতর ভগবানের বাণী—তাঁর আদেশ! এ ত আমি কোন দিন অমান্য করি নাই। মানুষের প্রতি মানুষের যে কর্ত্তব্য, তাহা আমি যথাসাধ্য অক্ষরে-অক্ষরে প্রতিপালন করিয়াছি। সে কর্ত্তব্যের ত্রুটী আমার স্বামীও ধরিতে পারিবে না। সেও ত মানুষ, সেও ত আমার শ্বশুরের পরিবারের একজন লোক; সে হিসাবে ত কোন ভুল কখন করি নাই। তাই যাইতে সম্মত হইলাম।

কিন্তু, সকলের সঙ্গে দেখা হওয়া তার অদৃষ্টে ছিল না। আমরা যেদিন সেখানে অপরাহ্ণ তিনটার সময় পৌঁছিলাম, সেই দিনই প্রাতঃকালে তাহার জীবন শেষ হইয়াছিল। সারাদিন-রাত অজ্ঞান থাকিয়া তাহার দেহাবসান হইয়াছে। সঙ্গে বাড়ীর যে চাকর ছিল, সে বলিল, চিকিৎসার কোন ত্রুটী হয় নাই, ডাক্তার সাহেব বলিয়াছিলেন, পাকস্থলী পচিয়া গিয়াছিল। চিকিৎসায় কিছু হয় নাই। বিদেশে, জন্মভূমি হইতে বহুদূরে তাহার জীবনলীলা শেষ হইয়া গেল।

সেই রাত্রিতেই আমরা লক্ষ্ণৌ ত্যাগ করিলাম। বড় বাবু এবং

আমার শাশুড়ী কাঁদিতে লাগিলেন ; আমি চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। কান্না আসিল না। কাহার জন্য কাঁদিব ? পৃথিবীতে প্রতিদিন শত শত লোক মরিতেছে। কৈ, তাহাদের জন্য ত কাঁদি না। এ লোকটাও আমায় কাছে সেই শত-সহস্রেরই একজন, তার বেশী নয়। তবে পরিচিত বটে ! তিন বৎসরের পরিচয়। মিথ্যা বলিব না ; একটা সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়াছিলাম। তখন কি মনে হইয়াছিল, তাহা ঠিক বলিতে পারিব না। আর এত কথা বাবা, তোমাকে বলিয়াই বা কি হইবে ? তাহার সঙ্গে ত তোমার কোন সম্বন্ধই নাই !

বাড়ীতে আসিলাম ; দশদিন ফলমূল আহারের ব্যবস্থা হইল ;— আমি যে বিধবা ! মনে মনে বলিলাম, সধবাই বা কবে ছিলাম, বিধবাই বা কবে হইলাম। কুমারী-জীবনই ত যাপন করিতেছি। যাক্, সমাজে আছি, সমাজের নিয়ম ত পালন করিতে হইবে। শ্রাদ্ধ-শান্তি শেষ হইয়া গেলে, মায়ের মেয়ে মায়ের কোলে ফিরিয়া গেলাম ! এ তিন বৎসরের মধ্যে, সেই বিবাহের পরে একবার ভিন্ন কখন বাপের বাড়ী যাই নাই,—বাবার শ্রাদ্ধের সময়ও যাই নাই। মনে বড় ব্যথা পাইয়াই বাবার স্নেহের কোল ত্যাগ করিয়াছিলাম। এ জীবনটাকে ব্যর্থ করিবার, অভিশপ্ত করিবার মূলে—যাক্ সে কথা আর তুলিয়া কি করিব ? তিন বৎসর পরে পিতৃহীন পিত্রালয়ে গেলাম। বিধবা কন্যাকে মা বুকের মধ্যে টানিয়া লইলেন ;—অভিমানিনী, হৃদয়-হীনা দুহিতার সকল অপরাধ ক্ষমা করিলেন ; মায়ের মত এমন ক্ষমা-

শীলা কি আর কেউ আছে? সন্তানের মঙ্গলের জন্য মা যে কি করিতে পারেন, তা—থাক্, সে কথা পরে হইবে।

বাড়ীতে তিন চার মাস কাটিয়া গেল। ইহার মধ্যে আমার বড় যা দুই একবার আমাকে শ্বশুরবাড়ী যাইবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিয়াছিলেন। আমার আর সেখানে যাইতে মন সরিল না।

এই সময়ে একবার দুই তিন দিনের জন্য দিদি আমাদের বাড়ী আসিলেন। তিনি সর্ব্বদা আসিতে পারিতেন না। প্রকাণ্ড সংসার; তাই তিনি মধ্যে-মধ্যে দুই একদিনের জন্য আসিতেন। আমি বিধবা হইয়া বাড়ীতে আসিবার পর এই তিনি প্রথম আসিলেন। আমার দুর্ভাগ্যের জন্য অনেক দুঃখ করিলেন; আমি যে অভিমান করিয়া তিন বৎসর আসি নাই, তাহার জন্যও স্নেহপূর্ণ ভর্ৎসনা করিলেন। তাহার পর মায়ের কাছে প্রস্তাব করিলেন যে, তিনি আমাকে কয়েক দিনের জন্য তাঁহার কাছে রাখিতে চান। মা তাহাতে আপত্তি করিলেন না। দিদির কাছে গেলে হয় ত আমার মন ভাল হইবে, এই ভাবিয়াই তিনি সম্মতি দান করিলেন। নৌকায় চড়িয়া দিদির সঙ্গে তাঁহার শ্বশুরগৃহে গেলাম।

দিদিই তাঁহার প্রকাণ্ড সংসারের সর্ব্বময়ী; তাঁর শাশুড়ী ননদ, দেবর ভাজ কেহই ছিল না। এত বড় সংসার তিনি একাকিনীই দেখিতেন। দুই চারি দিনেই দেখিলাম, দিদি সব বিষয়ে চৌকশ;

তাহার পরই বজ্রাঘাত হইল! দুই তিন মাস যাইতে না যাইতেই আমি আমার অবস্থা বুঝিতে পারিলাম! তখন আত্মহত্যা করিয়া কলঙ্ক মোচন করিতে প্রস্তুত হইলাম। কিন্তু কথাটা তাঁহাকে না জানাইয়া পারিলাম না। পত্র লিখিয়া তাঁহাকে সমস্ত অবস্থা জানাইলাম; আমার সঙ্কল্পের কথাও বলিলাম। তাহা ছাড়া যে আর পথ নাই, সে কথাও লিখিলাম। তিনি লিখিত উত্তর না দিয়া, একদিন নির্জ্জনে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তখন আমি আত্মহত্যার সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়াছি। কেন, শুনিবে বাবা! তোমারই জন্য আমার বুকের মধ্যে তখন যে 'মা' জাগিয়া উঠিয়াছিল। ভগিনীপতির সহিত যখন দেখা হইল, তখন বলিলাম, আমি মরিতে পারিব না, আমাকে বাঁচিতেই হইবে। তিনিও সে কথা স্বীকার করিলেন। যে পাপ তিনি করিয়াছেন, তাহাই যথেষ্ট; তাহার উপর মহাপাপের অনুষ্ঠানের চিন্তাও তিনি করিতে পারিলেন না। বিবাহ! তিনি তাহাতেও প্রস্তুত; কিন্তু আমি সে প্রস্তাবে কিছুতেই সম্মত হইলাম না। তাহা হইতেই পারে না। এত বড় নাম, এত সম্ভ্রম, এমন সাধ্বী পত্নীর ভালবাসা,—আমার জন্য তিনি সমস্ত ত্যাগ করিবেন। না, না, তাহা হইতেই পারে না। তাঁহার জন্য, তাঁহার সম্ভ্রম রক্ষার জন্য আমি আত্ম-বিসর্জ্জনে প্রস্তুত হইলাম। অনেক বাদানুবাদের পর স্থির হইল, তিনি কলিকাতায় আমার থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দিবেন; আমার ও আমার গর্ভস্থ সন্তানের

ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করিবেন। তাহার পর একদিন বাড়ীতে যাইবার ছলনা করিয়া তাঁহার সহিত নৌকাযোগে বাহির হইব। তিনি আমাকে কলিকাতায় রাখিয়া যাইবেন। বাড়ীতে যাইয়া প্রকাশ করিবেন, আমাদের নৌকা ডুবিয়া গিয়াছিল; তিনি অনেক কষ্টে প্রাণ বাঁচাইয়াছেন। আমার সন্ধান হইল না,—আমি ডুবিয়া মরিয়াছি।

তিনি তাহাই করিলেন। আমার প্রকৃত নাম গোপন করিয়া 'বিরাজমোহিনী' নামকরণ করিলেন এবং সেই নামেই এই বাড়ী কিনিলেন। তাঁহার এক বন্ধুর হাতে দিয়া ত্রিশহাজার টাকা যোড়া-বাগানের এক মহাজনের গদিতে আমার নামে সুদে জমা রাখিলেন। তাহার পর একদিন আমাকে পিত্রালয়ে পৌঁছাইয়া দিবার ছল করিয়া এই বাড়ীতে রাখিয়া গেলেন। দেশে প্রকাশ হইল, আমি পিত্রালয়ে যাইবার পথে নৌকা-ডুবি হইয়া মারা গিয়াছি।

তোমার মায়ায় বদ্ধ হইয়া বাপ আমার, আমি আত্মহত্যা করিতে পারি নাই। তোমার মুখ দেখিয়া জগতের নিকট মৃত আমি এতকাল বাঁচিয়া ছিলাম। আমার সময় শেষ হইয়াছে। তাই সমস্ত কথা তোমাকে জানাইলাম। এতদিন তোমাকে অন্ধকারে রাখিয়াছিলাম, এখন আরও অন্ধকারে ফেলিয়া গেলাম। তোমার পরিচয় তোমাকে দিতে পারিলাম না; কিন্তু তাই বলিয়া, তুমি আমার পুত্র, আমার প্রাণাধিক, তোমার কাছে প্রবঞ্চনা করিতে পারিলাম না; অকপটে

সমস্ত কথা বলিলাম। জননীর বিচারের ভার পুত্রের উপর! একটী কথা সুধু মনে রাখিও, তোমার জননী তাহার জীবনে একদিনের জন্য, সুধু একদিনের জন্য এক দেবহৃদয় পুরুষের নিকট তাহার দেহ উৎসর্গ করিয়াছিল। সেই এক দিনের স্মৃতি বুকে লইয়া তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে আমি চলিলাম!

৩

এখন—ন মাতা, ন পিতা, ন বন্ধু, ন চ বান্ধবা। ঠিক তাও নয়, মা বাপ আত্মীয়স্বজন কাহারও পরিচয় জানি না—জানিবার উপায়ও নেই। প্রয়োজনই বা আছে কি? আমি তাহ'লে কি? হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান কোন জাতির মধ্যেই যে আমার স্থান খুঁজে পাচ্ছি না। ব্রাহ্মণ, শূদ্র, চণ্ডাল, কোন সমাজেই যে আমার স্থান নাই। পরিচয় আমার কি? নামটা না হয় মা দিয়েছিলেন, কিন্তু ঐ যে 'মুখোপাধ্যায়' পদবী, ও ত আমার প্রাপ্য নয়। এই যে যজ্ঞোপবীত, এও ত আমি হিন্দুর শাস্ত্রানুসারে ধারণ করতে পারি না। এই যে অশৌচ-পালন, এ বিধিও ত আমার উপর খাটে না। মা ব্রাহ্মণের মেয়ে ছিলেন; যিনি আমার জনক, তিনিও ব্রাহ্মণ-সন্তান। কিন্তু, ব'লে দাও আমাকে তোমরা বাঙ্গালা দেশের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতমণ্ডলী, আমি কি ব্রাহ্মণ? শাস্ত্রানুসারে,—তোমাদের শাস্ত্রানুসারে আমাকে ব্রাহ্মণ-সন্তান ব'লে তোমরা কি গ্রহণ ক'রতে পার? জানি, তোমরা তা পার না; কিন্তু আমি ত মানুষ! আমি ত এই বাঙ্গালা দেশেই, এক বাঙ্গালী জননীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছি। আমার একটা জাতি তোমরা ঠিক করে দেও।

কি বলিলে, আমি বেশ্যা-পুত্র! কিছুতেই না,—এ কথা আমি কিছুতেই স্বীকার ক'র্‌ব না। আমার মা বেশ্যা? এমন কথা যে মুখে আনতে পারে, তাকে আমি মানুষ বলি না; তার কথা আমি গ্রাহ্য করি না। আমার মা, আমার জননী দ্বিচারিণী ছিলেন না। তুমি তোমার শাস্ত্র দিয়ে যা বিচার করতে হয়, কর, আমি ভগবানের শাস্ত্র অনুসারে ব'ল্‌ছি, আমার মা—আমার মা!

পত্র পড়বার পর অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত এমন কত কথাই ভেবেছিলাম; তার সব কি মনে আছে? একটা কথা সুধু মনে আছে; আমি সেদিন সারারাত সুধু মাকে দেখেছি। কি মলিন সে মুখ! কিন্তু-সে মুখে ত কলঙ্কের কালিমা আমি দেখি নাই। সে মুখ স্নেহ-বাৎসল্যে পূর্ণ! আর মলিন হ'লেও সে মুখে পবিত্রতাই আমি দেখেছি। আমি সারা রাত সুধু তাই দেখেছি, আর মা, মা বলে কেঁদেছি!

মার মুখের শেষ কথা—'ক্ষ'। মা ক্ষমা চাইছিলেন। কিসের জন্য ক্ষমা? কার কাছে ক্ষমা? কেন, কি অপরাধে? কে বিচার ক'র্‌বে? এদেশে নয় মা, এদেশে নয়; তোমার বিচার-ভার সেই পরম বিচারকের হাতে।

বাড়ীতে সেই অন্ধকার রাত্রিতে আমি আর বুড়া ঝি! আমি বোধ হয় এক একবার মা, মা বলে চেঁচিয়ে উঠেছিলাম। তাই ঝি তাড়া-তাড়ি আমার কাছে এসে, আমার গায়ে ঠেলা দিয়ে বলেছিল, কি বাবা, অমন ক'র্‌ছ কেন? ভয় পাচ্ছে?

ভয় ত আমার পায় নাই। আমি, বড়ই বিপন্ন হয়েই ডেকেছিলাম। কাকে ডাক্‌ব? এই সসাগরা ধরণীতে মা ছাড়া আমার ডাক্‌বার ত আর কেহই নাই। জন্মের পর যখন জ্ঞান হয়েছে, তখন থেকে শুধু মাকেই জানি। মায়ের উপর নির্ভর করে, বিপদে সম্পদে মাকেই ডেকে আমি তৃপ্তি পেয়েছি; মায়ের নামামৃত পান করেই আজ এই সতর বৎসর আমি বেঁচে আছি। তাই, কোন দিকে কুল-কিনারা না পেয়ে মাকেই ডেকেছিলাম। ভয়ে নয়, আমার জীবন-গতি নির্ণয় ক'র্‌বার জন্যই মাকে ডেকেছিলাম।

ঝিয়ের কথায় আমার সংজ্ঞা ফিরে এল। আমি বল্‌লাম, না ঝি! আমার ভয় ক'র্‌বে কেন? কিসের ভয়?

ঝি কাতর স্বরে বলিল, ছেলেমানুষ, ভয় ত পাবারই কথা। কোন ভয় নেই বাবা! আমি আর পাশের ঘরে যাচ্ছিনে; এখানেই থাক্‌ব। তুমি একটু ঘুমোও বাবা!

আমি ব'ল্‌লাম, আমার যে ঘুম পাচ্ছে না।

ঝি বল্‌ল, এত কষ্টের পর, এত ভাবনা মাথায় নিয়ে ঘুম যে আস্‌তে চায় না, তা বেশ বুঝি বাবা! তা ভেবে আর কি করবে। গিন্নীর সময় হয়েছিল, চলে গেলেন। তবে এখন যে তুমি একেলা কি করবে, আমিও তাই ভাবছি। কোথায় যে তোমার কে আছে, তা ত জানিনে; গিন্নীও কোন দিন—আজ এই পনর বছরের মধ্যে বলেন নি। আর কাউকে ত কোন দিন এ বাড়ীতে আস্‌তেও দেখিনি।

তুমি যখন দুই বছরের, তখন আমি এসেছি ; এর মধ্যে কারও সন্ধান ত পেলাম না। গিন্নীকে কতদিন জিজ্ঞাসা করেছি, হাঁ মা, তোমার কি শ্বশুরবংশে, বাপ-ভাইয়ের বংশে কেউ নেই ? গিন্নী কাঁদ-কাঁদ মুখে বল্‌তেন, ঐ প্রেম আর তুমি ছাড়া আর কোথাও আমার কেউ নেই। শুনে মন যে কেমন করত বাবা, তা আর তোমাকে কি বল্‌ব। আমি যে এমন হতভাগী, তোমাদের দুয়োরে দাসীপনা করে খাই, আমারও আর কেউ না থাক্‌লেও একটা ভাই-পো আছে ; অসময়ে দাঁড়াবার যায়গা আছে। তোমার যে তাও নেই বাবা ! ভাবনারই ত কথা বটে ! তা দেখ, তুমি বেটাছেলে, তোমার ভয় কি, ভাবনা কি ? যদি মেয়ে হ'তে, তা হলে ভাবনার কথা ছিলই ত ! কিছু ভেব না ; তোমার কোন কষ্ট হবে না। টাকাকড়ি তোমার অনেক আছে ; সে কথা আমি কতদিন গিন্নীর কাছে শুনেছি। তবে লোকজন ; তা যে কয়দিন এই বুড়ী বেঁচে আছে, সে কয়দিন কষ্ট হবে না ; গিন্নী যে তোমাকে আমার হাতে দিয়ে গিয়েছেন। ভয় কি বাবা ! মা গিয়েছেন, আমি ত আছি। তুমি এখন একটু ঘুমোও ; এখনও অনেক রাত আছে। না ঘুমুলে শরীর যে খারাপ হবে। এই বলিয়া ঝি ঘরের কোণ হইতে একটা ছেঁড়া মাদুর আনিয়া আমারই কম্বল-শয্যার পাশে বিছাইয়া শয়ন করিল। আমি আর কোন কথা না বলিয়া পুনরায় চিন্তামগ্ন হলাম।

এখন কার কাছে যাই ; কাকে আমার জীবনের কাহিনী বলে

পরামর্শ জিজ্ঞাসা করি? যাকে-তাকে এ কথা বল্‌তে পারব না, এ কথা ত গোপনই রাখা উচিত। কথাটা না হয় গোপন করলাম; কিন্তু আমাব কর্ত্তব্য কি কিছু নেই? আমি এ ছদ্মবেশে থাকৃতে পারব না। যা আমি নই, সমাজ আমাকে যে অধিকার দিতে চাইবে না, আমি ছলনা করে সে অধিকার গ্রহণ করব কেন? আমি কি, সেইটা বুঝতে হবে। কার কাছে যাব?

তখন মনে হোলো, আমার কলেজের এক অধ্যাপকের কথা। হাঁ, এ সমস্যার মীমাংসা তিনিই করতে পারবেন। তাঁর স্নেহে আমি বঞ্চিত হব না। তাঁরই কাছে যাব।

বুকের ভার যেন একটু নেমে গেল। সেই দেবপ্রতিম, তেজস্বী ব্রাহ্মণ-প্রবরের কথা ভাবতে-ভাবতে আমি ঘুমিয়ে পড়লাম।

৪

প্রাতঃকালে উঠেই আমার সেই পূজনীয় অধ্যাপকের বাড়ীতে যাবার জন্য বেরুব, এমন সময় বুড়া ঝি জিজ্ঞাসা করিল, বাবা, এত সকালে কোথায় যাবে ?

আমি বললাম, একবার বরাহনগর যাব। সেখানে আমার এক মাষ্টার আছেন। তিনি আমাকে বড় ভালবাসেন। তাঁর কাছে যাই। এই ত দেখ্‌তে দেখ্‌তে তিন দিন হোলো ; কি করা না করা, তার একটা পরামর্শের দরকার। আত্মীয় কাউকেই জানিনে, চিনিওনে। তাই যিনি ভালবাসেন, তাঁরই কাছে যাচ্ছি ঝি ! তুমি বাড়ীতেই থেকো। আমি এই দশটার মধ্যেই ফিরে আস্‌তে পারব।

ঝি বলিল, তা ত যেতেই হয়, নইলে তুমি ছেলেমানুষ, কিছুই জান না। যাঁরা জানেন-শোনেন, তাঁদের পরামর্শ ত নিতেই হবে। তবে আমি বলি কি, একেবারে হবিষ্যি সেরে দুপুর-পরে গেলেই ভাল হয় ; আস্‌তে একটু দেরী হলেও কোন কষ্ট হবে না। কা'ল হবিষ্যি করনি। আজ তার সব ব্যবস্থা করতে হবে। কি কি আন্‌তে হবে, সে সব ঠিক করতে হয়। আর আমি বুড়া-মানুষ ; গিন্নী যখন বেঁচে ছিলেন, তখন এক রকম তিনিই সব চালিয়ে নিয়েছিলেন, আমি উপলক্ষ মাত্র ছিলাম। এখন ত দেখে-শুনে

একজন চাকরও রাখ্‌তে হয়, আর এই কটা দিন গেলে একটা রাঁধুনীও ঠিক করতে হয়, কি বল?

আমি বললাম, সে সব করা যাবে ঝি। আমাকে এই বেলাই বরাহনগর যেতে হবে। যাঁর কাছে যাচ্ছি, তিনি নানা কাজের লোক, বিকেলে বাড়ী থাকেন না। এখন গেলে তাঁকে নিশ্চয়ই বাড়ীতে পাওয়া যাবে, তাই যাচ্ছি। আর দেখ, আমি ফিরে আসি, তখন হবিষ্যির যা হয় করা যাবে।

ঝি বলল, সে কি করে হবে বাবা! অত বেলায় কি বাজারে কিছু মিল্‌বে।

আমি হাসিয়া বলিলাম, বাজারের দরকার কি? দুটো আতপ চা'ল; তা দোকানেই পাওয়া যাবে। আর কিছুরই দরকার হবে না। সে যা হয়, তখন দেখা যাবে। তুমি নিজের মত ব্যবস্থা কিছু করে নিও। তোমার কাছে ত খরচের টাকা আছে ঝি?

ঝি বলল, থাক্‌বে না কেন? পয়সা-কড়ি আমার কাছে আছে।

তা হ'লে আমি এখন আসি, এই ব'লে বাহির হ'য়ে পড়লাম।

বরাহনগরে আমার অধ্যাপকের বাড়ীতে পৌঁছিতে প্রায় আটটা বেজে গেল। সেদিন যেন কি উপলক্ষে আমাদের কলেজ বন্ধ ছিল; অধ্যাপক মহাশয় বাড়ীতেই ছিলেন।

আমাকে দেখে তিনি সস্নেহে বললেন, কি প্রেম, এ বেশ! মা কবে গেলেন?

আমি বললাম, পরশু তিনি মারা গেছেন।

অধ্যাপক মহাশয় বললেন, কি হয়েছিল? কৈ, তুমি ত কোন সংবাদই দেও নেই। চার পাঁচ দিন তোমাকে ক্লাসেও দেখিনি বটে! কিন্তু আমরা এমনি গুরু যে, শিষ্যদের কার কি হোলো, তার খবরও আমরা নিইনে।

আমি বললাম, এই তিন চার দিনের জ্বরেই তিনি চলে গেছেন। প্রথম দুই দিন ত কিছুতেই ডাক্তার ডাক্‌তে দিলেন না। মরবার দিন যখন অজ্ঞান হয়ে পড়লেন, তখন ডাক্তার আন্‌লাম। তিনি বল্‌লেন, আর চিকিৎসার সময় নেই।

আমার এই অধ্যাপক মহাশয়ের নাম শ্রীযুক্ত কমলকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি এম-এ পাশ করেছিলেন ইংরাজী-সাহিত্যে; কিন্তু আমাদের কলেজে পড়ান সংস্কৃত। সুধু সংস্কৃত নয়,—যখন যে বিষয়ের অধ্যাপক যে কোন শ্রেণীতে অনুপস্থিত থাকেন, কমলবাবু সেই শ্রেণীর সেই বিষয়ই পড়াইয়া দিয়া আসেন,—তা কে বা জানে গণিত, আর কে বা জানে দর্শন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে বলতেন, আরে বাবা, তোদের এই বিশ্ব-ভাণ্ডারে যা যা একটু-একটু শেখানো হয়, তা, যার একটু মোটামুটি কাণ্ডজ্ঞান আছে, আর যে নিতান্ত পাথুরে গাধা নয়, সেই পড়িয়ে দিতে পারে। তাঁকে দেখলে কারও সাধ্য ছিল না যে, বলে তিনি ইংরাজী লেখাপড়া জানেন;—না ছিল তাঁর দশ-আনা ছ-আনা চুল ছাঁটা, না ছিল তাঁর চোখে সোনার চস্‌মা, না ছিল তাঁর টেরী,

না ছিল তাঁর টিকি ;—একেবারে সাদাসিদে মানুষ। বরাহনগরে বাড়ী,—আর কলেজ সেই মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীটে (তখনও নূতন রিপন কলেজের বাড়ী হয় নাই) ; এতখানি পথ তিনি, কিবা রৌদ্র কিবা বৃষ্টি, রোজ পদব্রজে আস্‌তেন-যেতেন ; জিজ্ঞাসা করলে বল্‌তেন, ওহে, এ আর কতটুকু পথ ; পেট ভরে খাবে, আর তিন ক্রোশ চার ক্রোশ হাঁটবে, রোগের বাবারও সাধ্য নেই যে কাছে ঘেঁসে। সত্যসত্যই আমরা কোন দিন তাঁর কোন অসুখ দেখি নাই। যাক্‌, কমলবাবুর কথা অনেক বল্‌তে হবে ; এখন এখানেই চুপ করে আসল কথা বলি।

কমল বাবু বল্‌লেন, তা বলে দুঃখ কোরো না প্রেম ! আমাদের ব্রাহ্মণের বিধবারা কিছুতেই ডাক্তারী ঔষধ ব্যবহার করতে চান না। তারপর অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার ত কোন অসুবিধা হয় নি ; লোকজন ত জুটেছিল। কলেজে কাউকে দিয়ে যদি একটু খবর পাঠাতে, তা হলে তোমাকে কোন বেগই পেতে হোতো না। ছেলেমানুষ, হয় ত ভারি গোলে পড়েছিলে।

আমি বললাম, না, কোন অসুবিধা হয়নি ; পাড়ায় আমাদের কলেজের দু তিনটা মেস আছে ; সেখান থেকেই সবাই এসে যা যা করবার, করেছিল ; আমাকে কোন অসুবিধাতেই পড়তে হয়নি।

কমল বাবু বললেন, তা হলে, আজ তিনদিন হোলো কেমন ? এখন কি রকম কি করবে ঠিক করলে। তোমার অবস্থার কথা ত বিশেষ কিছু

জানিনে; তোমার কাছেই একদিন শুনেছিলাম, তোমার আত্মীয়স্বজন কেউ নেই; তবে কিঞ্চিৎ আয় আছে, আর একখানা বাড়ীও আছে। কেমন? তার অধিক ত কিছু জানিনে। সে সব জান্‌তে পারলে, তবে কর্ত্তব্য সম্বন্ধে উপদেশও দিতে পারি, ব্যবস্থাও করতে পারি।

আমি বললাম, সেই উপদেশ আর ব্যবস্থার জন্যই আপনার কাছে এসেছি। আপনি ছাড়া আর কারও কাছে আমি যেতে পারিনে, ইচ্ছেও নেই।

কমল বাবু বললেন, সে কথা ছেড়ে দেও। আমি আর কার জন্য কি-ই বা করি, বা কি-ই বা পেরে উঠি। সেকালের গুরুশিষ্য সম্বন্ধ কি আর এখনকার কলেজে আছে। অনেক ছাত্রের হয় ত নামও জানিনে, এমনি গুরুগিরি করি। সে কথা থাক্, এখন বল ত তোমার প্রকৃত অবস্থা কি?

আমি বললাম, সে কথা বল্‌বার পূর্ব্বে আপনকে একখানি পত্র পড়তে হবে। এ পত্র আমি আর কাউকে দেখাতে পারিনে।

এমন কি পত্র প্রেম!

আপনি পড়লেই জানতে পারবেন। এই বলে আমি আমার মায়ের লিখিত সেই পত্রখানি তাঁহার হাতে দিলাম।

তিনি পত্রখানি হাতে নিয়ে বললেন, এ পত্র কার? কে কাকে লিখেছেন?

আমি বলিলাম, আপনি পড়লেই বুঝতে পারবেন।

তিনি বিশেষ মনোযোগের সহিত পত্রখানি আগাগোড়া পাঠ করিলেন। পাঠান্তে গভীর চিন্তায় ডুবে গেলেন, আমি তাঁহার দিকে চাহিয়া মেজেয় চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম।

৫

কমল বাবু প্রায় দশ মিনিট চুপ করিয়া বসিয়া কেবল ঐ চিঠিখানি নাড়াচাড়া করিতে লাগিলেন। তারপর আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, হুঁ। তার পর।

আমি অতি কাতরকণ্ঠে বলিলাম, আপনার কাছে এসেছি।

কমল বাবু ধীরে ধীরে বলিলেন, সে ভালই করেছ। এ চিঠির কথা আর কেউ জানে?

না।

তুমি নিতান্ত বালক নও। চিঠি পড়ে কিছুই কি ভাব নাই? কোন পথই কি তোমার মনে আসে নাই।

আমি বলিলাম, কাল বিকেলে চিঠিখানি আমি পড়েছি। তার পর সারা-রাতই ভেবেছি। শেষে যখন কোন কূল-কিনারা পেলেম না, তখন আপনার উপর নির্ভর করে ভাবনা ছেড়ে দিলাম।

তা বেশ করেছ। কিন্তু, সমস্যা অতি গুরুতর। কোন্ দিক দিয়ে এর মীমাংসা করা যায়, সে বিশেষ চিন্তার বিষয়। এক হ'তে পারে, এ চিঠিখানির অস্তিত্ব ভুলে যাওয়া। তা তুমিও পারবে না, আমিও কিছুতেই সে কথা তোমাকে বল্‌তে পারব না।

আপনি যে তা বল্‌তে পারবেন না, সে কথা আমি জানি। তাই আপনার কাছে এসেছি। আর, সে ইচ্ছাই যদি আমার থাকত, তা হলে আমিই এ চিঠিখানি গোপন করে ফেল্‌তাম। তা আমি পারি না, অন্ততঃ আপনার মত গুরুর শিষ্য হয়ে তা আমি পারি না, কিছুতেই না।

কমল বাবু বলিলেন, তা হ'লে তুমি কি করতে চাও।

আমি সব ত্যাগ করতে চাই।

সবটা কি, ভাল করে বল।

আমার এই নাম, এই পদবী, এই ব্রাহ্মণ বলে পরিচয়, এই উপবীত, এই অশৌচের বসন,—এ সবই আমি ত্যাগ করতে চাই।

আর কি?

এই হিন্দু বলে পরিচয় পর্য্যন্ত।

তা হ'লে তুমি কি হতে চাও?

সেই উপদেশ নিতেই ত এসেছি।

নাম ত্যাগ করবে কেন? এ নামের সঙ্গে ত কোন কিছুরই সম্বন্ধ নেই। হিন্দুর নামও প্রেমময় হতে পারে, মুসলমানও ইচ্ছা করলে এ নাম গ্রহণ করতে পারে; খৃষ্টানও পারে। নামের ত কোন অপরাধ নেই প্রেম! আর এ সব তুমি ত্যাগই বা করতে চাও কেন?

কেন? এ সবই যে আমার মিথ্যা! এ সবই প্রতারণা। আমার

স্নেহে মুগ্ধ হয়ে মা এ সকল প্রতারণা করতে বাধ্য হয়েছিলেন, তা আমি বেশ বুঝতে পারছি। কিন্তু, আমার ত সে বাধ্যবাধকতা মোটেই নেই। আমি এ মিথ্যা আচরণ করব কেন? এ প্রতারণা করব কেন? নামের কথা বলছেন? বেশ, নাম ত্যাগ করব না। কিন্তু, পদবী? তাতে কি আমার অধিকার আছে?

কমল বাবু অতি কাতর স্বরে বলিলেন, না প্রেম, আমি স্বীকার করছি, ও পদবীতে তোমার অধিকার নেই। স্বধু মুখোপাধ্যায় বন্দ্যোপাধ্যায় কেন, ব্রাহ্মণের কোন পদবীতেই তোমার অধিকার নেই।

কলেজের রেজেষ্টরীতে, বিশ্ববিদ্যালয়ের খাতায় আমার নাম, পিতার নাম যা লেখা আছে, তাও তা হলে তুলে দিতে হবে?

হাঁ হবে, কিন্তু, তার বদলে কি তুমি বসাতে চাও?

সে কথা আমি জানিনে, আপনি বলে দিন।

প্রেম, তুমি কি তোমাকে হিন্দু বলে পরিচয় দিতেও কুণ্ঠিত হচ্ছ?

না, মনে-প্রাণে আমি কুণ্ঠিত নই। আমাকে যদি আপনি জিজ্ঞাসা করেন, তা হলে আমি অসঙ্কোচে বলব যে, আমার হিন্দু বলবার অধিকার আছে,—আমি ব্রাহ্মণ-সন্তান; আমি সৎকুলোদ্ভব; আমি সতী মায়ের গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছি; পূর্ণ ব্রাহ্মণত্বের দাবী আমার আছে। আমি কোন ব্রাহ্মণ অপেক্ষা হীন নহি। আমি

এই সতর বৎসর যথানিয়মে ব্রাহ্মণের আচার প্রতিপালন করেছি; ত্রিসন্ধ্যা সন্ধ্যাবন্দনা করেছি। কোন শাস্ত্রবিরুদ্ধ কার্য্য আমি কখন করি নাই। উপবীত গ্রহণ করবার পর থেকে এই এতদিন আমি কোন শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান বাদ দিই নাই; মায়ের আদেশ শিরোধার্য্য করেছি। আপনি জানেন না মাষ্টার মশাই, আমি বুদ্ধি পড়ে অবধি, এই শেষ দিন পর্য্যন্ত দেখেছি, মা আমার কঠোর ব্রহ্মচর্য্য পালন করেছেন; কোন দিন কোন ত্রুটী তাঁর দেখি নাই। সে কঠোরতা আমি অতি কম ব্রাহ্মণ কন্যারই দেখেছি—বোধ হয় দেখিই নাই। এ সব ত গেল আমার দিকের কথা। কিন্তু আপনারা কি আমাকে ব্রাহ্মণ ব'লে স্বীকার করবেন?

কমল বাবু বসিয়া ছিলেন, উঠিয়া আমার নিকটে আসিয়া আমার হাত দুইখানি চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, শোন প্রেম, আমি নিজে তোমাকে গ্রহণ করিতে সম্মত আছি। ব্রাহ্মণ বলিয়া তোমাকে শ্রেষ্ঠ আসন দিতেও আমি অণুমাত্র দ্বিধা করিব না।

কিন্তু, বর্ত্তমান হিন্দু-সমাজ, ব্রাহ্মণ-সমাজ,—তাঁরা কি আমাকে গ্রহণ করতে রাজী হবেন?

না, তাঁরা রাজী হবেন না;—হতেও পারেন না। তাঁরা আসল কথাটা ভেবে দেখবেন না; সে বিধিও তাঁরা মানবেন না। তাঁরা লৌকিক ক্রিয়ার ব্যভিচারই লক্ষ্য করবেন এবং সেই অনুসারেই বিচার করবেন। তাতে তাঁদের দোষও দেওয়া যায় না।

আমি বললাম, আমিও দোষ দিচ্ছি না; আমি সমালোচনা করছি না। আমি বেশ বুঝতে পারছি, বর্ত্তমান সমাজ আমাকে নিতে পারে না। এখন কর্ত্তব্য কি?

কোন্ সম্বন্ধে কর্ত্তব্যের কথা জিজ্ঞাসা করছ?

সব সম্বন্ধেই। আমি একটী একটী করে জিজ্ঞাসা করি, আপনি উত্তর দেন। প্রথম জিজ্ঞাস্য, আমি কি উপাধি গ্রহণ করব?

দেখ, তোমার জন্মদাতার নাম অজ্ঞাত; তিনি কোন্ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাহাও জানবার উপায় নাই; সুতরাং তোমার উপাধি যে কি হবে, আমি তাহা বলিতে পারছি না।

আমার দ্বিতীয় জিজ্ঞাস্য, আমি কি জাতি? আমার বর্ণ কি?

প্রেম, তোমার মাতা ব্যভিচারিণী ছিলেন না, এ কথা আমি সর্ব্বান্তঃ-করণে স্বীকার করি; কারণ যাঁর সঙ্গে তাঁর আমাদের শাস্ত্রানুসারে বিবাহ হয়েছিল, তিনি তাঁর সঙ্গে কোন দিন স্বামী-স্ত্রী ভাবে সহবাস করেন নাই। শাস্ত্রানুসারে বিবাহিতা হইলেও তিনি তাঁহার শাস্ত্র-মতে গৃহীত পতি হইতে সম্পূর্ণভাবে পৃথক ছিলেন; এবং তাঁহার কুমারীধর্ম্মই রক্ষা করে এসেছেন। তিনি স্পষ্টবাক্যেই এ কথা বলে গিয়েছেন; এবং তাঁর কথা যে সত্য, তাহাতে আমার একটুও দ্বিধা নাই। কিন্তু, তারপর তিনি ক্ষণিক মোহে যে কাজটী করেছিলেন, তা কি সমর্থন করা যায়? সমাজ কি তা সমর্থন করতে পারে? দেখ, আমি তোমার মায়ের উপর অবিচার করছি নে। তিনি তখন পূর্ণ যুবতী। তিনি

বড় ঘরের মেয়ে ছিলেন; ভোগ-বিলাসের মধ্যেই পরিবর্দ্ধিত হয়েছিলেন। আমরা যাকে শিক্ষা বলি, সে শিক্ষাও লাভ করেছিলেন; বর্ত্তমান সময়ের উপযোগী মনের বলও তাঁহার যথেষ্ট ছিল। পাপকে তিনি ঘৃণা করতেন; নইলে পিতামাতা তাঁকে যে অসচ্চরিত্র, মদ্যপ যুবকের সহিত বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ করেছিলেন, তাঁকে,—সেই কলুষিত-চরিত্র যুবককে, তিনি মনে-প্রাণে স্বামী বলে গ্রহণ করতে— তার শয্যাভাগিনী হতে, অস্বীকার করতে পারতেন না। মনের বল অনন্যসাধারণ না হ'লে, পাপের প্রতি অবিমিশ্র ঘৃণা না থাক্‌লে, সতীত্বের অতুলনীয় গর্ব্ব না থাক্‌লে, কোন্ যুবতী এমনভাবে নিজেকে পৃথক রাখতে পারে? আর এর জন্য তাঁকে কম লাঞ্ছনা, কম নির্য্যাতন ভোগ করতে হয় নাই। শুধু নিজের পবিত্রতা রক্ষার জন্য, স্বামী-নামধারী এক স্খলিত-চরিত্র যুবকের কাম-সঙ্গিনী হয়ে নিজের নৈতিক জীবনকে ঘৃণ্য না করে, মহিমময়ী করবার জন্য এমন চেষ্টা অতি কম স্ত্রীলোকই করতে পারে। এর জন্য আমি তাঁকে সহস্র মুখে সাধুবাদ করি। কিন্তু তারপর কি হোলো; এমন তেজ, এত সতীত্ব-গর্ব্ব, এমন পাপের প্রতি ঘৃণার কি শোচনীয় পরিণাম হোলো। তুমি বল্‌বে 'To err is human, to forgive Divine. আমি এ কথা খুব মেনে নিচ্ছি; মুনিনাঞ্চ মতিভ্রমঃ, এ কথাও আমি ভুলি নাই। রক্ত-মাংসের শরীর নিয়ে বাস করতে গেলে এমন প্রলোভন অনেকের সম্মুখে আসে। যে তাকে জয় করতে পারে, সেই ধন্য; যে না পারে,

তার জীবন বিফল হয়ে যায়। এই ক্ষণিক মোহকে আমি সর্ব্বান্তঃকরণে ক্ষমা করতে প্রস্তুত; কিন্তু সমাজ নামক যে প্রতিষ্ঠান, বিশেষতঃ আমাদের এই হিন্দু-সমাজ যে, এমন কাজকে উপেক্ষা করতে পারে না, প্রশ্রয় দিতে পারে না, এটাও ত ভেবে দেখ্‌তে হবে। আবার তার সঙ্গে-সঙ্গে এ কথাও নিশ্চয়ই ভাবতে হবে যে, এক মুহূর্ত্তের দুর্ব্বলতার জন্য যার একবার পদস্খলন হয়েছে, তাকে যে একেবারে সমাজের বার করে দিতে হবে, তাকে যে প্রায়শ্চিত্তের, অনুশোচনারও অবকাশ দেবে না, তাকে যে একটা সহানুভূতিসূচক কথাও বল্‌বে না, তার স্থান যে গণিকাশ্রেণীতে স্থির করে দেবে, এমন অবিচারও আমি করতে বলি না। তা করতে গেলে তোমার ন্যায় উন্নত-চরিত্র, পবিত্র সোণার-চাঁদের উপর যে অত্যাচার করা হয়, তা আমি মর্ম্মে-মর্ম্মে অনুভব করছি। এখন বুঝেছ আমার কথা;—একদিকে বর্ত্তমান সমাজ,—শাস্ত্র-শাসিত সমাজ, আর একদিকে মনুষ্যত্ব। এর কোনটাই যে আমরা ত্যাগ করতে পারি না। সমাজের অশেষ দোষ আছে; সমাজের মধ্যে অনেক পাপ আছে; অনেক কুক্রিয়াকে আমরা ঢেকে নিয়ে সমাজে চালাচ্ছি। কিন্তু প্রকাশ্যভাবে কি তা পারছি? অনেক ভণ্ডামি চল্‌ছে, আমরা তা দেখেও দেখ্‌ছি নে, শুনেও শুনছি নে। মিথ্যাকে প্রশ্রয় দিচ্ছি;—তবুও জোর করে অন্যায়ের বিরুদ্ধে, কপটতার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারছিনে। তাই, আমি কমলকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, আমাকেও নিতান্ত ভীরুর মত, কাপুরুষের মত কথা বল্‌তে—

কমল বাবুর কথা শেষ না হইতেই তাঁহার বৃদ্ধা মাতা সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিলেন কি বল্‌ছিস্ কমল, কি তুই ভীরুর মত, কাপুরুষের মত। কথাটা কি রে? আমার দিকে দৃষ্টি পড়িতেই তিনি বলিলেন এ কি! তোমার এ বেশ কেন?

আমি উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলাম, পরশু আমার মা মারা গিয়েছেন।

কমল বাবুর মা বলিলেন, মারা গিয়েছেন? কি হয়েছিলে?

আমি বললাম, তিন দিনের জ্বরে পরশু তিনি মারা গেছেন!

আহা বড়ই দুঃখের কথা! শুনেছি, তোমার ঐ মা ছাড়া নাকি আর কেউ নেই। তা হলে ত তুমি একেবারে পথে দাঁড়িয়েছ।

কমল বাবু বলিলেন, মা, তুমি ঠিক বলেছ, ছেলেটা একেবারে পথে দাঁড়িয়েছে; সংসারে ওর মত হতভাগ্য আর দুটী নেই মা!

কমল বাবুর মা বলিলেন, তা ওর কাছে তুই ভীরু, কাপুরুষ, কি সব বল্‌ছিলি কেন? ও কি করেছে?

কমলবাবু বলিলেন, ও কিছু করে নাই; ওকেও বকছিলাম না। বকছিলাম আমাকে, তোমার এই ভীরু, কাপুরুষ ছেলেকে।

কমল বাবুর মা বলিলেন, কেন, তুই কি কিছু অন্যায় করেছিস্?

অন্যায় করেছি বই কি মা! যা সত্যি বলে মনে বুঝতে পারছি, যা না করা পরম অধর্ম্ম বলে বিশ্বাস করি, সমাজের মুখের দিকে চেয়ে তাও যে আমাদের করতে হয়।

অমন কথা বলিস্‌নে কমল। ওতে পাপ হয়। আমাদের ধর্ম্মকে কি তুই এতই হেয় মনে করিস যে, সে তোকে সত্য পথে চলতে, ন্যায়' কাজ করতে বাধা দেবে। সে কথাই নয় রে! ও তোদের বুঝবার ভুল। বল্ ত, ব্যাপারটা কি? আমি তোকে বুঝিয়ে দিচ্ছি!

কমল বাবু বলিলেন, আমরা যে সমস্যায় পড়েছি, তা বুঝিয়ে নেবার জন্য তোমার কাছেই যেতে হোতো মা! প্রেমের কোন কথার জবাব আমি দিয়ে উঠতে পারছিলাম না। তার জবাব হরকান্ত ন্যায়ালঙ্কারের মেয়েই দিতে পারে।

যা, যা, তুই আর আমাকে আকাশে তুলিস্‌নে। আমি ত আর তোদের মত এত দেখিনি। তবে বাবার কাছে বসে-বসে শাস্ত্রের কথা অনেক শুনেছিলাম; তাই এক এক সময় তোকে একটা-আদটা কথা বলি। তা, সে কথা যাক্। তোদের সমস্যা কি, আমাকে বলতে পারিস্।

কমল বাবু আমার দিকে চাহিলেন। আমি বলিলাম মাষ্টার মহাশয়, ওঁর কাছে কথাটা গোপন রাখলে অধর্ম্ম হবে। আপনি সব খুলে বলুন; উনিই আমাকে ঠিক পরামর্শ দিতে পারবেন।

কমল বাবু বলিলেন, মা, তা হলে তোমার চস্‌মাখানা এনে দিই; তোমাকে একখানা চিঠি পড়তে হবে।

চসমা আর আনবি কেন? তুই পড় না, আমি শুনি।

কমল বাবু বলিলেন, সে পত্র চেঁচিয়ে পড়া ঠিক হবে না। আমি

তোমার চসমাখানাই নিয়ে আসি। এই বলিয়া কমল বাবু অন্য ঘরে চলিয়া গেলেন।

তাঁহার মা আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি চিঠি প্রেম? কার চিঠি? আর তাতে এমনই বা কি আছে, যা চেঁচিয়ে পড়া যায় না।

আমি বলিলাম, চিঠিখানি আমার মা মরবার পূর্ব্বে আমাকে লিখেছিলেন। আমাকে শেষ দিন বলে গিয়েছিলেন যে, তাঁর মৃত্যুর পর যেন আমি চিঠিখানি পড়ি। আমি কা'ল বিকেলে চিঠি পড়েছি। আজ প্রাতঃকালে উঠেই তাই মাষ্টার মহাশয়ের কাছে এসেছি। চিঠিতে আমার সম্বন্ধে অনেক কথা আছে। আপনি পড়্লেই সব জানতে পারবেন।

সেই সময় কমল বাবু চসমা লইয়া আসিলেন। চিঠিখানি তাঁহার হাতেই দিল। তিনি চিঠিখানি মায়ের হাতে দিয়া বলিলেন, মা, এই সেই চিঠি। তুমি ভাল করে পড়ে, যা উপদেশ দেবে, প্রেম তাই করবে। আমি ওকে কিছুই বল্‌তে পারি নাই।

কমল বাবুর মা অতি ধীরে-ধীরে মনে মনে পত্রখানি পড়িতে লাগিলেন; আমরা দুইজন তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম।

৬

পত্রখানি পড়া শেষ করিতে কমল বাবুর মাতার একটু সময় লাগল; তিনি যেন পত্রের প্রত্যেক কথাটী ওজন করে পড়তে লাগলেন। পড়া শেষ হ'লে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করে বল্লেন, তোমার মায়ের পাপের প্রায়শ্চিত্ত তুমি করতে চাও। কেমন এই ত তোমার কথা প্রেম!

আমি বল্লাম, আমি আমার কর্ত্তব্য পালন করতে চাই; আর সেই কর্ত্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ নেবার জন্য আপনার কাছে এসেছি।

কমল বাবুর মা বললেন, কমল, তুমি উপদেশ দিতে ইতস্ততঃ করছ?

কমল বাবু কোন উত্তর করলেন না, চুপ করে বসে রইলেন।

আমি বল্লাম, আপনি যখন সে ভার নিলেন, তখন উনি আর কি বল্‌বেন?

কমল বাবুর মা বল্লেন, তুমি কি সমস্ত ত্যাগ করতে চাও?

তাই আমার ইচ্ছা।

কি বলে তোমার পরিচয় দেবে?

আমার কোন পরিচয়ই নাই।

তা ত হয় না ; লোকালয়ে বাস ক'র্‌তে হ'লে মানুষের পরিচয় চাই।

তা হ'লে আমাকে লোকালয় ছেড়ে যেতে হবে, বনে বাস ক'র্‌তে হবে।

কমল বাবুর মা বললেন, কেন, কিসের জন্য তুমি সব ছেড়ে বনে যাবে ?

যে নিজের কোন পরিচয় জানে না, তার স্থান কোথায় বলুন।

স্থানের কথা জিজ্ঞাসা করছ প্রেম ! **তোমার স্থান আমার কোলে**। এই বলে তিনি উঠে এসে আমাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলেন।

আমি অবাক্ হয়ে গেলাম ! এই বৃদ্ধা, ধর্ম্মপরায়ণা, নিষ্ঠাবতী ব্রাহ্মণকন্যা বলেন কি ? তিনি আমাকে তাঁহার কোলে স্থান দেবেন ? আমি,—যার জাত নেই, যে হিন্দু ব'লে পরিচয় দেবার অধিকারী নয় ; যার নাম নেই, পদবী নেই, গোত্র নেই, সে এমন আশ্রয় যে স্বপ্নেও ভাবে নাই !

তখন আমাদের কাহারও কথা বলিবার শক্তি ছিল না। ভূমিষ্ঠ হয়ে এক মায়ের ক্রোড় পেয়েছিলাম, আর আজ এই বড় দুর্দ্দিনে আর এক স্নেহময়ী, মহিমময়ী দেবীর শান্তিপূর্ণ ক্রোড়ে আশ্রয় পেলাম। কথা কি এ সময় আসে ?

কমল বাবুর মা বললেন, শোন কমল, শোন প্রেম, তোমার

মায়ের চিঠিখানি প'ড়তে প'ড়তে আমি অনেক কথা ভেবেছি। সুধু আজ কেন, অনেক দিন থেকে আমি কতকগুলি কথা ভাবছিলাম। আজ তোমার মায়ের পত্রখানি পড়ে সেই সব কথাই আমার মনে হোলো। কথাগুলো তোমাদের কাছে কেমন বোধ হবে জানিনে; বিশেষতঃ, আমার মত ব্রাহ্মণের কন্যার মুখ দিয়ে যে এমন কথা বেরুতে পারে, তাতে তোমাদের আশ্চর্য্য বোধ হ'তে পারে। আমি সেকেলে মানুষ বটে; কিন্তু একালের কথাও অনেক জানি। আমার কথা কি জান কমল? এই প্রেমময়ের মায়ের জীবনের কথা দিয়েই বলি। ধর, আমাদের দেশের বিবাহের কথা। আমাদের যাঁরা শাস্ত্র-বিধি নির্ণয় করে গিয়েছেন, তাঁদের অসাধারণ জ্ঞান ছিল। তাঁরা অনেক ভেবে, অনেক বুঝে এই সব ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু, তাঁরা একটা কথা ভেবে দেখেন নি। আমাদের এই দেশটায় যে এ রকম একটা অদল-বদল হয়ে যাবে, সে কথা তাঁরা ভাবেন নি। সেকালের সে সব ব্যবস্থা এখন আর চলে না। এই বিবাহের কথাতেই বলি। সেকালের বাপ-মা মেয়ের বিয়ে দিতে হ'লে বরের কুলশীল দেখ্‌তেন; বরের বংশে কোন প্রকার রোগ আছে কি না, তার সন্ধান নিতেন; বরের বংশ দীর্ঘজীবী কি না, তার সন্ধান নিতেন; তারপর বরটী সচ্চরিত্র কি না, সুশীল কি না, তা দেখ্‌তেন। এই রকম সমস্ত পরিচয় নিয়ে তবে মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধ করতেন। তার ফলও ভাল হোতো। তার পর

বাল্যবিবাহের কথা। তোমরা ইংরেজী পড়েছ; তোমরা বাল্য-বিবাহকে অন্যায় বলে মনে কর। আমি কিন্তু তা করিনে। তার কারণ এই যে, একটা ছোট মেয়েকে ঘরে এনে আমার কুলাচার, আমার বংশের বিশিষ্টতা, আমাদের আচার-ব্যবহার শিখিয়ে নিই। আমার সকলের সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে, সেই ভাবে তাকে গড়ে তুলবার যথেষ্ট অবকাশ আমরা পেতে পারি। ছোট মেয়েকে নিজের মত করে গড়ে তোলা যায়; কিন্তু বয়স্থা মেয়েকে গড়া যায় না; কারণ, সে তার বাপের বাড়ীতে যে গড়ন পায়, তা কিছুতেই ছাড়তে পারে না। সেই জন্যই ছোট মেয়ের বিয়ে আমি পছন্দ করি। আবার তার সঙ্গে সঙ্গে আর একটা কথাও বলি। বৌমা যতদিন পূর্ণ-যৌবনা না হবেন, ততদিন আমি তাঁকে স্বামীর কাছে যেতে দেব না। এই আমার মত। তা ত সকলে বোঝে না; তাই অল্প বয়সে বিবাহের পর দেখি যে, বারো বছরের মেয়ের ছেলে হয়; ছেলের বাপের বয়স হয় ত তখন আঠারো। এতেই দোষ। এখন প্রেমময়ের বাপের কথা ভাব। তার বাপ-মা মেয়ের বিয়ে কি ভাবে দিলেন, ভাব দেখি। মেয়ের বয়স তখন ষোল বছর। তাকে বেশ লেখাপড়া শিখান হয়েছিল; ভালমন্দ, ধর্ম্মাধর্ম্ম সম্বন্ধেও তার বেশ একটা ধারণা জন্মেছিল। তার বিয়ে দেওয়া হলো একটা মাতাল, লম্পট, বড়মানুষের ছেলের সঙ্গে। সেকালে এমন ভাবে কারোর বিয়ে দেওয়া হতো না। যাক্ সে কথা। প্রেমের মা, শ্বশুর-বাড়ীতে যে দিন গেল, সেই দিনই একটা দাসীর মুখে

তার স্বামীর কুচরিত্রের কথা সে শুনতে পেলে। সে বালিকা নয়; তার মন তখনই একেবারে স্বামীর বিরুদ্ধে বিতৃষ্ণায় ভরে গেল। সে এমন দুশ্চরিত্র যুবককে স্বামী বলে গ্রহণ করতে পারল না। এতে আমি তার কোন অপরাধ দেখ্‌ছিনে। তুমি যাকে-তাকে ধরে এনে স্বামী বলে গছিয়ে দেবে, আর সে তাকে অমনি দেবতা বলে পূজা করতে আরম্ভ করবে, এ হতেই পারে না। যেহেতু তুমি দশটা মন্ত্র পড়ে দুইহাত এক করে দিলে, আর তাদের একজন আর একজনের সর্ব্বময় কর্ত্তা হয়ে বস্‌ল, এ কথাই নয়। সেকালে এমন করে মেয়ে বলি দেবার প্রথা ছিল না; গুণবান, সচ্চরিত্র, সুবোধ ছেলে দেখে, বংশ দেখে, তবে মেয়ের বিবাহ দেওয়া হত; মেয়েও তেমন স্বামী পেয়ে তাঁর চরণে আত্ম-সমর্পণ করত। প্রেমের মায়ের সম্বন্ধে কি তা করা হয়েছিল? কিছুতেই না। তা হলে, সে যে এমন দুশ্চরিত্রকে স্বামী বলে স্বীকার করে নাই, আবার বল্‌ছি, তাতে তার কোন অপরাধ হয় নাই। স্ত্রীলোকেরই সুচরিত্রা, পবিত্রহৃদয়া হতে হবে, আর পুরুষের তা হতে হবে না, এমন কথা শাস্ত্র বল্‌তে পারে না। স্ত্রীলোক দুশ্চরিত্রা হলে সে স্বামীর ত্যাজ্য, বেশ কথা; কিন্তু স্বামী দুশ্চরিত্র হলে সে পত্নীর ত্যাজ্য হবে না কেন, তার কোন যুক্তি দেখাতে পার? পরপুরুষের সহবাসে স্ত্রীর মহাপাতক হয়; অসতীর স্থান নরকেও হয় না। তেমনি অসৎ পুরুষের সহবাসও স্ত্রীর পক্ষে সমভাবে বর্জ্জনীয়। আমি বলি তা তে রমণীর দেবী-দেহ অপবিত্র হয়।

সচ্চরিত্রা নারী এমন পুরুষকে বর্জ্জন করবে, তা হোক না সে পুরুষ তার মন্ত্রপড়া স্বামী। কথাটা তোমাদের কাছে আশ্চর্য্য বোধ হচ্চে; কিন্তু আমি যা বল্‌ছি, তা আমি অনেক ভেবে বল্‌ছি। স্ত্রী পুরুষ উভয়কেই পবিত্র হতে হবে। তুমি পুরুষ যদি দানব হও, তা হলে নারীও দানবী হবে। তাই হচ্চে; তাই পাপে পৃথিবী পূর্ণ হয়ে গেল। সুতরাং প্রেমের মা যে তার স্বামীকে স্বামী বলে গ্রহণ করে নাই; তিন বৎসর অনেক যন্ত্রণা, অনেক লাঞ্ছনা সহ্য করেও যে সে সেই লম্পটের কাম-সঙ্গিনী হয় নাই, এতে তার সতীত্বের গর্ব্বই প্রকাশ পেয়েছে। এর জন্য আমি তাকে নিন্দা করতে পারব না। এই যে একটা বিসদৃশ ব্যাপার, এর জন্য দায়ী তার পিতামাতা, তার অভিভাবক। এমন করে একটা জীবনকে ব্যর্থ করে দেবার অধিকার কাহারও নাই। শাস্ত্রের বিধান এ নয়, কি বল কমল?

কমল বাবু বল্‌লেন, তা হলে মা, তুমি কি বল্‌তে চাও, দুশ্চরিত্র ব্যক্তির বিবাহে অধিকার নেই, অবশ্য হিন্দুশাস্ত্র-মতে?

কমল বাবুর মা বল্‌লেন, হাঁ, আমি তাই বলি; আমাদের মুনিঋষিরাও তাই বলেন। অধর্ম্ম-বিবাহ হতেই পারে না। স্ত্রীকে সহধর্ম্মিণী করতে হবে, এই হচ্চে শাস্ত্রের বিধান। দুশ্চরিত্রের বিবাহে তা হয় না; সে কাম-বিবাহ। যা এখন হচ্চে, আর যাকে সেই সনাতন পবিত্র মন্ত্র পড়ে অপমান করা হচ্চে, আর তার ফল যে কি, তা ঘরে ঘরেই দেখ্‌তে পাচ্ছ।

কমল বাবু বল্‌লেন, এটা কি অবিচার হচ্চে না? কুচরিত্র ব্যক্তি কি সুচরিত্র হ'তে পারে না? তোমার কথা মেনে নিলে যে কত জীবন ব্যর্থ হয়ে যায়। কুপথগামী যে নিজের ভ্রম বুঝতে পেরে সুপথে আসে, এর দৃষ্টান্ত ত অনেক আছে মা!

কমল বাবুর মা বল্‌লেন, তা আমি অস্বীকার করিনে। কিন্তু সে ব্যবস্থা তুমি শুধু পুরুষের দিক চেয়েই করছ কেন? মেয়েরা কি সে অনুগ্রহ পেতে পারে না? ক্ষণিক মোহে, সাধারণ মানব-সুলভ দুর্ব্বলতায় যে নারীর একবার—মাত্র একবার পদস্খলন হয়েছে, আর তার পর যে চিরজীবন সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছে, কঠোর সংযম করেছে, তার উপর কি তোমরা কোন করুণা দেখাও? এই প্রেমের মায়ের কথাই ভাব না। আমি তার এই পদস্খলনের সমর্থন করছি না;—হিন্দুর মেয়ে হয়ে—ব্রাহ্মণের কন্যা হয়ে, এমন ব্যাপারের সমর্থন করতে পারিনে। বিবাহের পর তিন বছর সে যে উঁচু সুরে মন বেঁধে রেখেছিল, যে দেবীত্বে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল, হতভাগী ক্ষণিক মোহে সে আসন থেকে একেবারে কোথায় যে নেমে গেল, তা ভাবতেও আমার কষ্ট হচ্চে,—আমার চোখে জল আস্‌ছে। কিন্তু সেই সঙ্গে এ কথাও তুমি ভুলো না বাবা কমল, কি ভাবে তাকে রাখা হয়েছিল। শ্বশুর-গৃহে সে দীর্ঘ তিন বৎসর কেবল গঞ্জনা, কেবল লাঞ্ছনা ভোগ করেছে; আর তা সে অম্লান-বদনে সহ্য করেছে। তারপর বিধবা হয়ে সে বাপের বাড়ীতে গেল। সেখানে তার শিক্ষার কি

ব্যবস্থা হয়েছিল? তার ব্রহ্মচর্য্য-সাধনের কি আয়োজন হয়েছিল? আমাদের হিন্দু-পরিবারে বিধবার স্থান কোথায় জান? অনেক পরিবারেই, কি শ্বশুরবাড়ীতে, কি বাপের বাড়ীতে, সে দাসী। দাসীর উচ্চ আসন সে পায় না। তারও ত মানুষের স্নেহ, মানুষের প্রাণ! এই ব্যবহারে তার মধ্যে যে মানুষটী আছে, তার হৃদয় কি বিষিয়ে ওঠে না? তারপর, যারা বড়মানুষ, ধনী, তোমাদের হিসাবে শিক্ষিত, তারা বিধবা কন্যা বা ভগিনীকে কি ভাবে প্রতিপালিত করে? তাকে জান্‌তে দিতে চায় না যে, সে বিধবা। তাকে নানা বিলাসে ডুবিয়ে রাখতে, ভুলিয়ে রাখ্‌তে চায়। সে যেটুকু লেখাপড়া শিখেছিল, তার সদ্ব্যবহার সে কি ভাবে করে, তাও তোমাদের অজানা নেই। সেই অপাঠ্য কুপাঠ্য বইয়ের সকল বিষ আকণ্ঠ পান করে, তার মনে কি ভাবের উদয় হয়, তার হৃদয়ে কি চাঞ্চল্য জন্মে, সে কথাটাও ভেবে দেখো। তার যা ফল হয়, তা এই প্রেমের মায়ের জীবনেই দেখ্‌তে পাচ্ছ। সে তার সংযম, তার নারীধর্ম্মের মর্য্যাদা, পবিত্রতা রক্ষা করতে পারল না। তার জন্য তাকে অভিশাপ দিতে চাও, দাও কমল! কিন্তু একটু দয়া, একটু সহানুভূতি কি সে হতভাগী তোমার-আমার কাছে পেতে পারে না? যে নিজেকে সংযত রাখতে পারে, নিজেকে ব্রহ্মচর্য্য-সাধনে তৎপর করতে পারে, সে বিধবাকে দেবী বলে আমরা পূজা করি; কিন্তু যে হতভাগী ক্ষণিক মোহে একবারের জন্য পথভ্রষ্ট হয়, আর পরক্ষণেই যার

হাহাকারে বুক ফেটে যায়, চারিদিক অন্ধকার দেখে ; আর অবশিষ্ট জীবন সেই ক্ষণিক পতনের প্রায়শ্চিত্ত করে, তার জন্য একটু সহানুভূতি, একটু কৃপা কি তোমার ভাণ্ডারে থাকবে না বাপ কমল ? প্রেমের মায়ের অবস্থা কি তাই নয় ? এই সোণারচাঁদ ছেলের জন্য সে সব ত্যাগ করে এসেছিল। যে তাকে কুপথে নিয়ে গিয়েছিল, অথবা যাকে ঐ হতভাগীই ক্ষণিক সুখের আশায় প্রলুব্ধ করেছিল, সে ত এর প্রতিবিধান করতে চেয়েছিল—যে প্রতিবিধান তার পক্ষে সম্ভব ! কিন্তু, প্রেমের মা তাকে তা করতে দেয় নাই। তার জীবনকে অকূলে ভাসিয়ে না দিয়ে, সমাজে তাকে কলঙ্কিত না করে, সমস্ত কলঙ্ক নিজের স্কন্ধে নিয়ে সে নিজেকে ডুবিয়ে দিয়েছিল। আজ এই দীর্ঘ সতর বৎসর সে কি কঠোর না করেছে ! সুতরাং বাবা কমল ! সে একটু—সামান্য একটু সহানুভূতি তোমার কাছে পাবার অধিকারী ! আর সে সহানুভূতি সে তার নিজের জন্য চাইচে না ; চাইছে তার এই সন্তানের জন্য। সমাজ সেটুকুও তাকে দিতে চাইবে না, তা জানি ; সেইজন্যই তুমি ইতস্ততঃ করছিলে কমল ! কিন্তু মায়ের স্নেহ যে কোন বন্ধনই মানে না। আমিও যে মা ! প্রেমের মাও যে মা ছিল ! আর সব কথা ভুলে যাও ; শুধু সেই মাতৃমূর্ত্তি মনে কর। তারই জন্য আমি এই প্রেমকে কোলে তুলে নিয়েছি ; এবং এই কোলেই তাকে আশ্রয় দেব। তোর সন্তান নেই কমল ! আজ আমি তোকে এই বালকের পিতৃত্বে বরণ করলাম ; এই তোর পুত্র। আমাদের হিন্দু শাস্ত্রানুসারে

তুই একে গ্রহণ করতে পারবিনে, তা জানি ; কিন্তু সকল শাস্ত্রের উপর আর এক শাস্ত্র আছে—ভগবানের শাস্ত্র—বিশ্বের শাস্ত্র। সেই শাস্ত্র তোকে বাধা দেবে না—দিতে পারে না বাবা! এই বলিয়া তিনি আমাকে কমল বাবুর কোলের কাছে ঠেলিয়া দিলেন। কমল বাবু আমাকে তাঁর সেই অভয় বক্ষে ধারণ করে ছলছল চক্ষে বল্‌লেন, মায়ের আদেশের চাইতে বড় আদেশ আর নেই! পৃথিবীর সকল শাস্ত্রের, সকল অনুশাসনের অনেক উপরে মায়ের আদেশ, ঐ কথা তোমার পদপ্রান্তে বসেই শিখেছি মা! আমি তোমার আদেশ শিরোধার্য্য করলাম। আয় বাবা প্রেম, আজ থেকে তুই আমার!

৭

কমল বাবুর মা বল্‌লেন, প্রেম, তোমার কথার শেষ নিষ্পত্তি হয়ে গেল ত ?

আমি বললাম, আপনি আজ আমাকে কোলে তুলে নিয়ে, বল্‌তে গেলে আমার নবজীবন দিলেন ; আমার একটা পরিচয়ের পথ করে দিলেন।

কমল বাবু বললেন, দেখ প্রেম, প্রধান কথা শেষ হয়ে গেল, এখন অন্যান্য বিষয় ঠিক করতে হচ্চে, কেমন ?

আমি বল্‌লাম, আমি একে একে বলি, আপনারা শুনুন। প্রথম, আমি যখন ব্রাহ্মণ বলে পরিচয় দেবার অধিকারী নই, তখন আমি আমার মুখোপাধ্যায় উপাধি, আর উপবীত ত্যাগ করব। এ মিথ্যা অভিনয় করতে যাব কেন ? কলেজেও আমার নাম থেকে উপাধি তুলে নেব। কেহ যদি জিজ্ঞাসা করে আমার জাতি কি, তা হলে বলব, আমার কোন জাতি নেই। তারপর দ্বিতীয় কথা, আমি মায়ের শ্রাদ্ধ কি ভাবে করব ? কেউ যখন আমাকে ব্রাহ্মণ বলে স্বীকার করবে না, তখন এ ব্রাহ্মণের বেশ ধরে, ব্রাহ্মণের আচার-অনুষ্ঠান আমি করতে পারব না ; লোককে ঠকাতে যাব না।

কমল বাবুর মা বল্‌লেন, তোমার প্রথম কথায় আমি মত দিচ্ছি। কিন্তু দ্বিতীয় কথা সম্বন্ধে আমার আপত্তি আছে। তোমার মা তোমাকে ব্রাহ্মণ-সন্তানের মতই প্রতিপালন করেছেন; যথাশাস্ত্র উপনয়ন দিয়েছেন। সে সব তুমি ত্যাগ করতে পার। কেন তুমি ছলনা করবে। কিন্তু এই কটা দিন তোমাকে ব্রাহ্মণোচিত ব্যবহার করতে হবে? তেমনি ভাবেই তোমার মায়ের শ্রাদ্ধ-কার্য্য শেষ করতে হবে। এটী তাঁরই ইচ্ছা বলে মনে করে নিও। তুমি হয় ত ভাবছ যে, এতে প্রতারণা করা হবে। তা হবে না; সমাজ তোমাকে গ্রহণ করতে পারে না, তুমিও সমাজের দ্বারস্থ হোয়ো না। তুমি এতদিন ব্রাহ্মণ-সন্তানের মত ছিলে, সেই ভাবেই শিক্ষা পেয়েছ; ব্রাহ্মণের মত উপনীত হয়েছ; ত্রিসন্ধ্যা-গায়ত্রী জপ কর। তুমি যখন মনে মনে ব্রাহ্মণই; সমাজ না বলুক, আমি যখন তোমাকে প্রকৃত ব্রাহ্মণ বলেই বুকে তুলে নিয়েছি, তখন মাতৃ-শ্রাদ্ধটা ব্রাহ্মণের মতই করবে। সে কয়দিন ব্রাহ্মণের আচার-অনুষ্ঠানই তোমাকে করতে হবে। শ্রাদ্ধের পর ব্রাহ্মণের বাহ্যিক চিহ্ন তুমি ত্যাগ কোরো, আমি নিষেধ করব না। নিজেকে ব্রাহ্মণ বলে পরিচয় দিও না—মানুষ বলে পরিচয় দিও। এ শ্রাদ্ধে পুরোহিত ডেকে কাজ নেই; আমার কমলই পুরোহিতের কাজ করবে। কাউকে নিমন্ত্রণ করেও কাজ নেই, ব্রাহ্মণ-ভোজনেরও প্রয়োজন নেই। কমল যা ভাল বুঝবে, সেই ভাবে তোমার মায়ের শ্রাদ্ধ শেষ করে দেবে। শ্রদ্ধা করে যা করবে,

তাতেই কাজ হবে, লোক-দেখানো কোন কিছুই তোমাকে করতে হবে না। লোকের সঙ্গে ত তোমার কোন সম্বন্ধ নাই। এই ব্যবস্থাই ঠিক রইল। আমার এখানেই শ্রাদ্ধ-কার্য্য শেষ হবে এবং তুমি আমাদেরই হয়ে থাক্‌বে।

আমি বল্‌লাম, বাড়ীর কি হবে? মাসিক খরচের টাকার কি হবে?

কমল বাবু এ প্রশ্নের উত্তর নিজে না দিয়ে, আমারই মত জিজ্ঞাসা করলেন।

আমি বল্‌লাম, আমি যা মনে করেছি, তা আপনাদের কাছে বল্‌ছি; তবে এ সব সম্বন্ধে আপনারা যা বল্‌বেন, তাই আমি মেনে নেব। আমার কথা এই যে, আমি ও-টাকা নেব না, আমি নিতে পারি না। ও-বাড়ীতেও বাস করতে পারিনে। মা অনেক ভেবে ঐ ব্যবস্থায় সম্মত হয়েছিলেন। সে আমাকে বাঁচাবার জন্য; নইলে তিনিও এ দান গ্রহণ করতেন না;—তাঁর যে তখন আর উপায় ছিল না। কিন্তু আমি যখন সব কথা জান্‌তে পেরেছি, তখন আমি এ দান গ্রহণ করব কেন? এ বাড়ীতে বাস করব কেন? এ সকল কিছুই ত আমার নয়। যে হতভাগ্য তার জনককে চিন্‌ল না, চিনবার উপায়ও যার নেই; যাকে তার জনক গ্রহণ করেন নাই, বল্‌তে গেলে ত্যাগই করেছেন,—তা যে কারণেই হোক,—তাঁর দান আমি গ্রহণ করব কেন? এ ভিক্ষা আমি নেব কেন? আমার ত

অভাব মিটে গেছে; আমাকে ত ভিক্ষা করে খেতে হবে না; আমি ত আজ থেকে নিরাশ্রয় নই। তবে ঐ দান আমি গ্রহণ করব কেন?

কমল বাবু বল্‌লেন, তোমাকে গ্রহণ করতে কেউ বল্‌বে না; কিন্তু তুমি কাকে ফিরিয়ে দেবে?

কেন? জোড়াবাগানের সেই আড়তের লোক এলে তাকে বলে দেব, যাঁর টাকা তিনি মারা গেছেন, আমার ওতে অধিকার নেই। তাঁদের যা ইচ্ছা, তাই তাঁরা ও-টাকার সম্বন্ধে করতে পারেন।

সে আড়ত তুমি চেন? কখন সেখানে গিয়েছিলে? কত টাকার সুদ পাও, বল্‌তে পার?

আমি বল্‌লাম সে আড়তের ঠিকানা জানি, নামও জানি। আমায় কখনও যেতে হয়নি; তাদের লোক এসে মাসে-মাসে টাকা দিয়ে যায়। কত টাকা জমা আছে বা কি আছে, তা বল্‌তে পারিনে; তবে মাসে ৮০৲ টাকা হিসাবে দিয়ে যায়, এই জানি।

কমল বাবু মনে মনে হিসাব করে বল্‌লেন, আমাদের মহাজনেরা সাধারণতঃ শতকরা মাসিক আট আনা অর্থাৎ বার্ষিক ছয় টাকা হিসাবেই সুদ দিয়ে থাকে। তাই যদি ধরা যায়, তা হলে সেই আড়তে তোমার মায়ের নামে ষোল হাজার টাকা জমা আছে; আর যদি সুদ কম হয়, তা হলে আরও বেশী টাকা জমা আছে। তার পর বাড়ীখানি আছে। এ সব কাকে ছেড়ে দেবে? টাকার

সুদটা তুমি না নিলে, তারা না হয় জমা রাখবে ; তার পর যা হয় ব্যবস্থা করবে। কিন্তু বাড়ীর কি হবে? বাড়ীর সম্বন্ধে সে আড়তের লোকেরা নিশ্চয়ই কিছু জানে না। বাড়ী কারও নয়, এই অবস্থায় পড়ে থাক্‌তে পারবে না। মিউনিসিপালিটী ট্যাক্‌সের দায়ে বাড়ী বেচে ফেল্‌বে ; টাকাগুলো ন দেবায় ন ধর্ম্মায় যাবে। যাক্ তার যা ব্যবস্থা হয়, আমিই সব করব। তুমি সেই আড়তদারের নাম ঠিকানাটা আমাকে বলে দেও।

আমি বল্‌লাম, ঘনশ্যাম নন্দীর আড়ত, জোড়াবাগান। এই বল্‌লেই নাকি জোড়াবাগানের যে কেউ আড়ত দেখিয়ে দেবে ; বাড়ীর ঠিকানার না কি দরকার হয় না।

কমল বাবুর মা বল্‌লেন, প্রেম, বেলা প্রায় দশটা বাজে। এত বেলায় আর বাড়ী ফিরে না গেলে। এখানেই হবিষ্যি কর। তার পর ও-বেলা তুমি আর কমল গিয়ে বাড়ীতে যা সব জিনিষপত্র আছে, নিয়ে এস। বাড়ী আপাততঃ বন্ধ থাক, পরে যা ব্যবস্থা হয় করা যাবে।

আমি বল্‌লাম, এ বেলা ত থাকা হয় না। বুড়ো ঝি পথের দিকে চেয়ে বসে আছে। ঐ ঝি আমাকে মানুষ করেছে। তার কি করব, সেও একটা ভাবনা। তার পর আমি ত এ কয়দিন হবিষ্যি করব না, ফল খেয়েই কাটাব মনে করেছি।

কমল বাবুর মা বল্‌লেন, তা অত কষ্ট কেন করবে? ছেলেমানুষ, অত কঠোর সইবে না, অসুস্থ হয়ে পড়বে।

আমি বল্‌লাম, দেখি, যে কয়দিন পারি।

কমল বাবু বল্‌লেন, যাবে যদি, তা হলে আর বিলম্ব কোরো না। আমি স্নান-আহার করেই তোমার ওখানে যাচ্ছি। তুমি কোথাও বেরিও না। তোমাদের সে ঝির সম্বন্ধেই বা কি করা যায়, তাও স্থির করতে হবে। সে দেখা যাবে। তুমি এস।

৮

বেলা একটার সময়ই দেখি কমল বাবু ভৈরব চাটুয্যের লেনে আমাদের বাড়ীতে এসে উপস্থিত। তিনি যে এই দুপহর রৌদ্রের মধ্যে আস্‌বেন, এ আমি ভাবিনি। আমি বল্‌লাম, মাষ্টার মশাই, এত রৌদ্রে না এলেই হোতো।

কমল বাবু বল্‌লেন, মা যে আমাকে দেরী করতে দিলেন না; বল্‌লেন আজই তোমাকে নিয়ে যেতে।

আমি বল্‌লাম সে কি করে হবে? বাড়ীতে যে সব জিনিষপত্র আছে, তা বেঁচে ফেল্‌তে হবে; ওর কিছুই আমি নিয়ে যাব না; শুধু আমার বইগুলি নেব, আর কিছু না। তার পর ঝিয়ের একটা ব্যবস্থা করতে হবে। আমি ওকে জিজ্ঞাসা করে জেনেছি, মেদিনীপুর জেলার কোন্ এক গাঁয়ে ওর এক বোন-পো আছে। মাঝে মাঝে তাকে আস্‌তেও দেখ্‌তাম; তখন অত খোঁজ করিনি। আমি আর বাড়ী রাখব না শুনে ঝি কাঁদতে লাগল; শেষে বল্‌লে যে, তাকে এই বুড়ো বয়সে বোন-পোর গলায় গিয়েই পড়তে হবে। আমি বলেছি যে, তাকে কারও গলগ্রহ হতে হবে না। সে যতদিন বাঁচবে, তত দিন তার কোন কষ্ট না হয়, সে ব্যবস্থা আমি করে দেব।

আমি মনে করছি কি জানেন? এই সব জিনিষপত্র বেচে যে টাকা হবে, তা ওকে দেব। আর মায়ের সিন্ধুক খুলে দেখ্‌লাম, প্রায় আটশ টাকা আছে; তাও ওকে দেব। তা হলে ওর আর কষ্ট হবে না। ওর সেই বোন-পোকে আস্‌বার জন্য পত্র লিখ্‌তে হবে। সে এসে ওকে না নিয়ে যাওয়া পর্য্যন্ত আমি কি করে বাড়ী ছেড়ে যাই।

কমল বাবু বল্‌লেন, জিনিষপত্র বেচবার জন্য ভাবতে হবে না। যারা পুরাণো জিনিস কেনে, তাদের একজনকে ডেকে সব জিনিষ দেখালে এখনই দর-দস্তর করে সব নিয়ে যাবে। তাতে দেরী হবে না। কিন্তু তোমার ঝিয়ের ব্যবস্থা করতেই সময় লাগবে। তা এক কাজ করা যাক্‌ না; ঝিকে ডেকে জিজ্ঞাসা কর, তার দেশের লোক কেউ এখানে আছে কি না; তার যদি যাতায়াতের খরচ আমরা দিই, তা হলে সে ওকে কা'ল নিয়ে যেতে পারে কি না।

ঝি রান্নাঘরে ছিল। তাকে ডেকে আনলাম। কমল বাবু তাকে বল্‌লেন, দেখ ঝি, প্রেম ছেলেমানুষ; তাকে একেলা এ বাড়ীতে রাখতে চাইনে। সে আমার ছাত্র। আমি তাকে ছেলের মত দেখি;— দেখি কেন, আমার ছেলে-মেয়ে নেই; প্রেমই আমার ছেলে। ওকে আমার বাড়ীতেই নিয়ে যাব; আমিই প্রতিপালন করব। এ বাড়ীটা মনে করছি ভাড়া দেব। আর ওর মায়ের শ্রাদ্ধ আমার বাড়ীতেই শেষ করব। এখন তোমার কথা। তুমি না কি তোমার বোন-পোর কাছে দেশে যেতে চেয়েছ। তাই তুমি যাও।

তুমি মনেও কোরো না যে, তোমাকে তাদের গলগ্রহ হতে হবে। আমরা তোমাকে যে টাকা দেব, তাতে তোমার কেন, তাদেরও যথেষ্ট সাহায্য হবে। এখন কথা হচ্চে, তোমার যাওয়া নিয়ে। আমি বলি কি, তুমি কালই দেশে যাও। এখানে কি তোমার দেশের এমন কেউ নেই, যে তোমাকে কা'ল দেশে রেখে আস্‌তে পারে? তার যাওয়া-আসার খরচ যা লাগে, আমরা দেব।

ঝি বল্‌ল, লোক আছে। আমার বোন-পোর গাঁয়ের রামকিঙ্কর এখানে চাকরীর জন্য এসেছে। এখনও তার কোনও চাকরী হয়নি। তাকে বল্‌লে সে এখনই যাবে। নিজের যখন খরচ লাগবে না, তখন যাবে না কেন?

কমল বাবু বল্‌লেন, তা হ'লে তাকেই ঠিক করে এস না। এখনই যাও। আমরা তোমার টাকাকড়ির সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। আর এই যে সব জিনিষপত্র আছে, এ সব আর টেনে নিয়ে গিয়ে কি করব। প্রেমের যা যা দরকার, তাই নিয়ে যাব, আর সব কা'ল সকালেই বেচে দেব।

ঝি বল্‌ল, তাই ত, গিন্নীর শ্রাদ্ধটা পর্য্যন্ত থেকে গেলেই ভাল হোতো। আমায় তিনি বড় ভালবাসত গো! ভারি ভালবাসত। আর তেনার কি বিশ্বেস ছিল আমার উপর; সর্ব্বস্ব দিয়েও তার ভয় ছিল না। আর জান্‌লে বাবু, সেই আঁতুর থেকে এই ছেলেকে আমি মানুষ করেছি। কি করব, অদৃষ্টে দুঃখ আছে। তিনি চলে

গেল ; ওর মুখপানে চাইবার আর কেউ রইল না। তা বাবু, ওকে ভাল করে রেখো। এমন ছেলে হয় না। মুখে রাটী পর্য্যন্ত নেই। যা দেবে তাই খাবে। এমন ছেলে হয় না। দেখো বাবু, আমার চাঁদের যেন কষ্ট না হয়। তিনি ত চলে গেল; যমে দেখে না এই বুড়ীকে। তা দেখ বাবা, আমার বাড়ীর ঠিকানা লিখে নেও। বাছার যদি অসুখ-বিসুখ করে, অমনি একখানা পোষ্টকাট দিও; আমি ছুটে আস্‌ব। আজ প্রায় এককুড়ি বছর কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছি। হায় আমার অদেষ্ট। ঝি আঁচলে চোখ মুছিল।

কমল বাবু বল্‌লেন, সে জন্য ভেবো না ঝি! বলেছি ত, আমার ছেলেপিলে নেই; ওকে আমি ছেলের মত প্রতিপালন করব।

ঝি বল্‌ল, তাই করো বাবু। দেখে নিও ও আমার কেমন ছেলে। আর দেখ, ওর যখন বিয়ে দেবে, তখন এই বুড়ীকে অঝিশ্যি-অঝিশ্যি খবর দিও, ভুলো না। আমি এসে বৌ-মার মুখখানি দেখে যাব। তিনি ত দেখ্‌তে পেল না, বুড়ী যদি বেঁচে থাকে, তবেই ত

কমল বাবু বল্‌লেন, সে খবর তুমি নিশ্চয়ই পাবে। আর আমার ঠিকানা তোমাকে আজই লিখে দেব। যখনই ওকে দেখ্‌বার জন্য তোমার মন কেমন করবে, তখনই তুমি কাউকে সঙ্গে করে এসে ওকে দেখে যেও; খরচের জন্য একটুও ভেবো না, বুঝলে। তা হলে, তোমার সেই লোকটীকে এখনই ডেকে নিয়ে এস; তাকে ভাল করে বলে দিই।

ঝি চলে গেলে কমল বাবু বল্‌লেন, প্রেম কাছে-কিনারে কোন বড় রকম পুরাণো জিনিষের দোকান আছে জান?

আমি বল্‌লাম, আমার চেনা দোকানদার একজন আছে, এই কাছেই।

কমল বাবু বল্‌লেন, যাও ত, তাকে এখনই ডেকে আন, একটা দর-দস্তুর করে ফেলি। তুমি না বল্‌ছিলে তোমার মায়ের সিন্দুকে আটশ টাকা আছে। সেই আটশ টাকা, আর এই সব জিনিষ বেচে যা হবে, তার থেকে দুশো টাকা,এই হাজার টাকা ঝিকে দেওয়া যাক্। কি বল?

আমি বল্‌লাম, আমিও তাই ভেবেছি। আমাদের দেখ্‌ছেন ত, জিনিষপত্র বেশী কিছু নেই; যা নইলে নয়, মা তাই করেছিলেন; মুল্যবান কিছুই তিনি করেন নি। এতে কি দুশো টাকা হবে?

কমল বাবু বল্‌লেন, তার অনেক বেশী হবে। তুমি যাও, দোকানদারকে ডেকে আনগে। আর দেরী কোরো না। সে যদি কাল জিনিষপত্র নিয়ে যেতে চায়, তা হলে আমাকে বাড়ী গিয়ে দুশো টাকা এনে আজই ঝিকে বিদায় করতে হবে।

নিকটেই দোকান ছিল। আমি দোকানদারকে ডাকিয়া আনিলে কমল বাবু তাহাকে সকল কথা বললেন এবং বাড়ীর দ্রব্যাদি দেখালেন। সে লোকটার অবস্থা ভাল। সে জিনিষপত্র দেখে বল্‌ল, ব্রাহ্মণের দ্রব্য; আমি কিছু বল্‌তে পারব না; আপনারা বিবেচনা-মত যা চাইবেন, তাই আমি দেব।

কমল বাবু বল্‌লেন, সে কি করে হবে। আমরা কিছুই বল্‌ব না। তুমিই যা হয় বল।

দোকানদার আবার ঘরগুলি ঘুরিয়া আসিয়া বল্‌ল জিনিষপত্র ত তেমন বেশী নেই; আর অনেকই পুরানো হয়ে গিয়েছে। আমি হিসেব করে দেখ্‌লাম, খুব বেশী হ'লে আমি পাঁচশ টাকা দিতে পারি, —সবই পুরাণো জিনিষ।

কমল বাবু তাতেই সম্মত হলেন এবং সেই দিনই দুশো টাকা চাইলেন। দোকানদার স্বীকার হল, বল্‌ল, বাবু আমার চেনা মানুষ; আমি জিনিসগুলো কা'ল সকালে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করব। বাবু আমার সঙ্গে আসুন; আমি এখনই দুশো টাকা দিচ্ছি।

কমল বাবু বল্‌লেন, যাও প্রেম, টাকাটা নিয়ে এস, আর একখানা রসিদও লিখে দিয়ে এসো।

দোকানদার বল্‌ল, রসিদ দিতে হবে না বাবু! আপনাদের কথাই রসিদ।

আমি তখন দোকানদারের সঙ্গে গিয়ে দুশো টাকা নিয়ে এলাম। মায়ের সিন্দুকে যে টাকা ছিল, তা গণে দেখা গেল, আটশ তেইশ টাকা রয়েছে।

কমল বাবু বল্‌লেন, তা হলে, সব জড়িয়ে একহাজার তেইশ টাকা হোলো। তোমার ঝিকে হাজার টাকা দেওয়া যাবে; দুজনের

গাড়ীভাড়া দশটাকা, আর যে লোকটা কষ্ট করে ঝিকে রেখে আসবে, তাকে দশটী টাকা দেওয়া যাবে। কি বল? তার পর, তোমার আর আজ বরাহনগর যাওয়া হয় না, কাল সকালেই একেবারে সব মিটিয়ে যাওয়া যাবে।

সেই সময় ঝি তার লোকটীকে সঙ্গে করে এল। সে পরদিন সকাল সাতটায় ঘাটাল ষ্টীমারে যেতে স্বীকার করল। সে রাত্রে এসে এখানেই থাকবে।

তারা চলে গেলে কমল বাবু বল্‌লেন, আমার একটু দরকার আছে। আমি তা সেরে সন্ধ্যার মধ্যেই আস্‌ছি, তুমি আজ বেরিও না।

আমি বল্‌লাম, না, আমি আমার বইগুলো গুছিয়ে নিই। আপনি আজ আর কেন আস্‌বেন? কা'ল সকালে এলেই হবে।

কমল বাবু বল্‌লেন, সে যা হয় দেখা যাবে।

কমল বাবু চলে গেলে ঝি পুনরায় কান্না আরম্ভ কর্‌ল। তার যত দুঃখের কথা বিনিয়ে-বিনিয়ে বল্‌তে লাগ্‌ল। তার কথা শুনতে-শুনতে আমারও কান্না পেতে লাগল। আমারই হতভাগ্য জীবনের কথা! এ সকল কথা যে আর শুনতে পাব না! এই সত্তর বছরের ইতিহাস! আজ আমি নাম-গোত্রহীন, সমাজ-পরিত্যক্ত! হায় অদৃষ্ট!

৯

সন্ধ্যার পূর্ব্বেই কমল বাবু এলেন। আমি তাঁকে দেখেই বললাম, সন্ধ্যার আর বিলম্ব নেই; আপনি বাড়ী যান।

তিনি বললেন, আমি বাড়ী থেকেই আস্‌ছি। তোমার যখন আজ যাওয়া হোলই না, তখন তোমাকে একেলা রেখে যাই কি করে। তাই বাড়ীতে গিয়ে মাকে বলে এলাম। আমি আজ এখানেই থাকব। কাল ঝিকে বিদায় করে, জিনিষপত্রগুলো চালান করে, তোমাকে নিয়ে বাড়ী যাব। কা'ল তাড়াতাড়িও নেই, রবিবার।

আমি বল্‌লাম, এত কষ্ট করে আস্‌বার কি দরকার ছিল। তারপর আপনার খাওয়া-দাওয়ারই বা কি হবে?

কমল বাবু বল্‌লেন, সে ভাবনা তোমাকে ভাবতে হ'বে না; আমি সে সব সেরে এসেছি। আমি এখান থেকে বেরিয়ে কোথায় গিয়ে-ছিলাম জান? তোমার সেই জোড়াবাগানের নন্দীর আড়তে গিয়ে-ছিলাম। যাঁর নামে আড়ত, সেই ঘনশ্যাম নন্দী এখন আর কাজকর্ম্ম দেখেন না; এখানে থাকেনও না। তিনি নবদ্বীপে থাকেন। তাঁর একমাত্র ছেলে নীরদশ্যাম বাবুই এখন কর্ত্তা। তিনি আড়তেই ছিলেন। তাঁকে তোমার মায়ের মৃত্যুর কথা বল্‌তে তিনি বল্‌লেন যে, তুমি নাবালক; তোমাকে ত তিনি এখন টাকা দিতে পারবেন না। আদা-

লত থেকে নাবালকের যিনি গার্জ্জেন হবেন, তাঁকেই তিনি সুদের টাকা দেবেন। আমি তাঁকে বল্লাম যে, টাকার জন্য আমি আসি নাই; নাবালকের গার্জ্জেন হবার দরখাস্ত আমিই করব। তুমি এখন আমার কাছেই থাক্‌বে। টাকার সুদ নেবার কোন তাড়াতাড়ি নেই। আগে আমি হাইকোর্ট থেকে গার্জ্জেন নিযুক্ত হই, তখন যা হয় ব্যবস্থা করা যাবে। তুমি যে ও-টাকা বা ওর সুদ নেবে না, সে কথা ওদের এখন বল্‌বার কোন দরকারই দেখ্‌লাম না। আমি যে তোমাকে বলেছিলাম, তোমার মায়ের নামে ষোল হাজার টাকা জমা আছে, তাই ঠিক ; ওরা শতকরা বার্ষিক ছয়টাকা সুদই দিচ্ছে। তার পর, আরও একটা সন্ধান নেবার চেষ্টা কর্‌লাম ; কিছুই জানতে পারলাম না। টাকাটা কে জমা দিয়াছিল, তার কোন নিদর্শন ওদের খাতাপত্রে নেই ; বিশেষ, অনেক দিন আগের কথা, নীরদশ্যাম বাবু তার কিছুই জানেন না। তাঁর বাপের আমলে টাকাটা জমা হয়েছিল। তাঁর বাপ হয় ত বল্‌তে পারেন, কে টাকা জমা দিয়েছিল।

আমি বল্‌লাম, সে কথা জান্‌বার ত কোন আবশ্যকই নাই। সে সংবাদ পেলেই বা আমার কি? আপনি ও-সব খোঁজ করবেন না। কি হবে জেনে? জানবেন, আমার আপনি ছাড়া আর এ সংসারে কেউ নেই। আমি কারও সন্ধান জানতে চাই নে।

কমল বাবু বল্‌লেন, প্রেম, তোমার প্রয়োজন না থাক্‌তে পারে, তোমার জেনেও কাজ নেই। কিন্তু, আমার কেমন একটা আগ্রহ,

হয়েছিল, তাই একটু অনুসন্ধান করছিলাম। কোন ফলই হলো না।

আমি বল্‌লাম, না হয়েছে, সে ভালই।

কমল বাবু বল্‌লেন, সে কথা যাক্। তোমাকে ত বলেছি, এই বাড়ীখানার একটা ব্যবস্থা করা দরকার। তুমি এর কিছু না নিতে পার; কিন্তু অকারণ বাড়ীখানা বিকিয়ে যাবে কেন? আমি স্থির করেছি, আমি তোমার সমস্ত সম্পত্তির গার্জ্জেন হবার জন্য দরখাস্ত করব। সেই দরখাস্ত মঞ্জুর হলে বাড়ীটা ভাড়া দেব। যে ভাড়া পাওয়া যাবে, তা আমি রাখব। পরে যা হয় করা যাবে।

আমি বল্‌লাম, আমার ত কোনই সম্পত্তি নেই; আমি নিঃসম্বল। আপনি ও-সব গোলের মধ্যে যাবেন না। সার্টিফিকেটের দরকার কি? আপনি ভগবানের কাছ থেকেই সার্টিফিকেট পেয়েছেন; ঠাকুর-মার আদেশ অপেক্ষা কি জজ-সাহেবের সার্টিফিকেট বড়?

কমল বাবু বল্‌লেন, ছেলেমানুষ; তুমি আইন-আদালতের কথা ত বোঝ না। টাকাগুলো আর বাড়ীখানা অমনি বেহাত হতে দিতে পারি নে। তুমি এর একটী পয়সাও না নিতে চাও, নিও না। আমি তোমার মায়ের নাম করে কোন সৎকার্য্যে সমস্ত দান করব। সেই অধিকার লাভ করতে হলে হাইকোর্টে আবেদন করে, তোমার আইন-সঙ্গত অভিভাবক আমাকে হ'তে হবে। এতে তোমার আপত্তি করবার কোন কারণ দেখ্‌ছি নে। আমি ত তোমাকে ঐ সম্পত্তির একটী

পয়সাও নিতে বল্‌ছিনে ; আমিও কিছু নেব না। আমার ছেলের ভরণপোষণ করবার ক্ষমতা ও সামর্থ্য আমার আছে। যারই সম্পত্তি হোক্, তা রক্ষা করবার যখন পথ রয়েছে, তখন সে পথ অবলম্বন করব না কেন ? তুমি সাবালক না হওয়া পর্য্যন্ত সমস্ত বিষয় আমার অধীনে থাক্‌বে। তারপর তোমার যা ইচ্ছা তাই কোরো ; আমি নিষেধ করব না।

কথাটা সঙ্গত বলেই আমাব মনে হোলো ; আমি আর কোন আপত্তি করলাম না। মায়ের শ্রাদ্ধ শেষ হয়ে গেলেই তিনি আমার অভিভাবক হবার জন্য হাইকোর্টে আবেদন করবেন, এই স্থির হয়ে গেল।

পরদিন প্রাতঃকালে ঝিকে টাকাকড়ি দিয়ে বিদায় করা গেল। সে কাঁদতে-কাঁদতে চলে গেল। তারপরই দোকানদার এসে সব জিনিষপত্র নিয়ে যেতে আরম্ভ করল। আমার তখন বড়ই কষ্ট হতে লাগল। এর প্রত্যেক জিনিসের সঙ্গে যে আমার মায়ের স্মৃতি জড়িত। আজ যে সব চলে যাচ্ছে ; তার একটু চিহ্নও আমি রাখতে পারছি নে। মায়ের হাতেরই সব জিনিষ বটে, কিন্তু কোথা থেকে এ সব এসেছিল ? না, না, ওর কোনটার দিকেই আমি চাইব না ; ওর কিছুই আমার নয়, আমার নয় ! মায়ের স্মৃতি অপেক্ষাও আর একটা কঠোর স্মৃতি যে ঐ সব জিনিষ আমার মনে জাগিয়ে দিচ্ছে। যাক্, সব চলে যাক্, আমার চক্ষের সম্মুখ থেকে। এই বাড়ী থেকে কাল চিরদিনের

জন্য বিদায় নেব। যতদিন বেঁচে থাকব, এই ভৈরব চাটুয্যের লেনে আমি আসব না !

বেলা দশটার মধ্যেই দোকানদার সব নিয়ে গেল ; অবশিষ্ট তিন-শত টাকাও দিয়ে গেল। তারপর আমার বইগুলি নিয়ে আমার জন্ম-গৃহ, আমার সতর বৎসরের আশ্রয়স্থান থেকে বিদায় গ্রহণ করলাম।

১০

এগার দিনে মায়ের শ্রাদ্ধ-কার্য্য শেষ করলাম। ব্রাহ্মণ সন্তানের যা যা করতে হয়, ঠিক তেমন ভাবেই অনুষ্ঠান হলো না। কমল বাবু আর তাঁর মা আমার মাতৃশ্রাদ্ধের জন্য নূতন পদ্ধতি বিধিবদ্ধ করেছিলেন। কমল বাবুর মা সাধারণ রমণী নন; সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার বিশেষ অধিকার। তাঁহার পিতা ছিলেন একজন প্রধান নৈয়ায়িক পণ্ডিত। তাঁর উপাধি ছিল ন্যায়-পঞ্চানন। তিনি পিতার নিকট যথারীতি সংস্কৃত অধ্যয়ন করেছিলেন। তারপর কমল বাবুর পিতামহ ছিলেন বিদ্যালঙ্কার, পিতা ছিলেন বাচস্পতি। কমল বাবু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজী সাহিত্যে এম-এ; এদিকে পিতা ও মাতার নিকট এত সংস্কৃত শিক্ষা করেছিলেন যে, আমাদের কলেজে তিনি সংস্কৃতেরই অধ্যাপক হয়েছিলেন। সুতরাং মা ও ছেলেতে মিলে যে এক নূতন সংস্কৃত পদ্ধতি আমার মায়ের শ্রাদ্ধে প্রণয়ন করবেন, তার আর আশ্চর্য্য কি? বাপের নাম জানা নেই, বংশ-পরিচয় নেই, গোত্র-কিছুই নেই, এমন অদ্ভুত ছেলের মাতৃশ্রাদ্ধে নব-সংহিতারই প্রয়োজন। তাই হয়েছিল,—আর সে ভালই হয়েছিল। সত্যসত্যই এই নূতন পদ্ধতি অনুসারে শ্রাদ্ধ করে আমারও তৃপ্তি বোধ হয়েছিল। কার্য্য শেষ

হলে আমার মাতৃশ্রাদ্ধের পুরোহিত কমল বাবু সেই নব-পদ্ধতি-পত্রখানি ছিঁড়ে ফেললেন। আমি কত অনুরোধ করলাম, তিনি শুনলেন না; বললেন, প্রেম, এর এখানেই শেষ। এ আর রেখে কাজ নেই।

শ্রাদ্ধ শেষ হলে আর কাহাকেও ভোজন করান হোলো না; জিনিষ বিক্রীর অবশিষ্ট তিনশত টাকা দরিদ্র-নারায়ণের সেবায় কমল বাবু ব্যয় করলেন। তাহারা আমার এ দান গ্রহণ করল; তাহারা আমার মাতার পরলৌকিক সদ্গতির কামনা করল। কিন্তু যে সমাজে আমি এই সতর বৎসর কাটালাম, তাহার দ্বারস্থ হলে কি হত? যাক্ সে কথা!

আমি এখন কমল বাবুর পালিত পুত্র। তাঁহার মাতাকে ঠাকুরমা বলেই সম্বোধন করি; তাঁহার স্ত্রীকে মা বলেই ডাকি; কিন্তু তাঁকে বাবা বল্‌তে আমার প্রাণে লাগে। বাবা! পিতা! এ নাম যে উচ্চারণ করবার আবার অধিকার নেই! আমি যে কোন দিন বল্‌তে পারব না—

পিতা ধর্ম্মঃ পিতা স্বর্গঃ পিতাহি পরমং তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রিয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ।

আমার মত হতভাগ্য কি কেউ আছে? কি দুর্ব্বহ জীবন আমার! কি অভিশপ্ত জন্ম আমার! তাই কমল বাবুকে 'বাবা' বলে ডাকতে

পারলাম না ; পূর্ব্বের মত এখনও তাঁকে 'মাষ্টার মহাশয়'ই বলি।

তিনি হাইকোর্টে আবেদন ক'রে আমার গার্জ্জেন হয়েছেন ; যথারীতি সার্টিফিকেটও পেয়েছেন ; বাড়ীটা ভাড়া দেবারও ব্যবস্থা করেছেন। আমি এদিকে কলেজে আমার নামের শেষের 'মুখোপাধ্যায়' উপাধি তুলিয়ে দিয়েছি ; বিশ্ববিদ্যালয়েও দরখাস্ত করে শুধু 'প্রেমময়' নামই মঞ্জুর করিয়ে নিয়েছি। বাপের নাম মুছে দিয়েছি ; অভিভাবক শ্রীযুক্ত কমলকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ। জাতি পর্য্যন্ত লোপ করেছি। কত জন কত কথা বলেছে, কত শ্লেষ করেছে, কত কুকথা বলেছে ; কিছুতেই কর্ণপাত করি নাই—এ সকলই যে আমার প্রাপ্য ! ঠাকুর-মার উপদেশে আমি অভিমান ত্যাগ করেছি। তিনি যখন আমাকে 'দাদা প্রেম' ব'লে ডাকেন, মা যখন আমাকে 'বাবা' বলে ডাকেন, তখন আমার মনে কি কোন ক্ষোভ থাকৃতে পারে ? চাই না আমি সমাজ ; হ'তে চাইনে আমি ব্রাহ্মণ ; পরিচয় দিতে চাইনে আমি হিন্দু ব'লে,—আমি কৃতার্থ ঠাকুরমায়ের 'দাদা' সম্বোধনে, আমি পবিত্র হ'য়ে যাই দেবীরূপিণী মায়ের 'বাবা' ডাকে। আমার মনে হয়,এর কাছে কি তুচ্ছ আমার মান-অভিমান। আর আমার ক্ষোভ নেই ! হিন্দু-সমাজে আমার স্থান নাই বা হোলো ;—আমি যে দেব-সমাজে স্থান পেয়েছি ! উপবীত আমি ত্যাগ করেছি,—প্রতারণা আমি ক'র্‌ব না। আমি এখন হিন্দু নই, মুসলমান নই, খৃষ্টান নই ;—কিন্তু যিনি হিন্দু,—

মুসলমান খৃষ্টানের পরমারাধ্য দেবতা, আমি এখন তাঁহারই সন্তান। আমি এখন বিশ্বজননীর ছেলে, বিশ্বপিতার পুত্র! আমার অতীত বহুদূরে চ'লে গেছে—বহু—বহুদূরে;—ভবিষ্যতের ভাবনা আমি ভবানীর চরণে ন্যস্ত করেছি;—এখন আছেন আমার ঠাকুর-মা, আমার মা, আর আমার মাষ্টার মহাশয় কমল বাবু!

১১

মাস তিন চার পরের একদিনের একটা বলি। আমাদের কলেজ, কি একটা উপলক্ষে যেন তিন দিনের জন্য বন্ধ ছিল। বর্দ্ধমান কাটোয়া অঞ্চলে মাষ্টার-মহাশয়দের কিছু জমিজমা আছে। তাহারই খাজানা আদায় করতে মাষ্টার মহাশয় কাটোয়ায় গিয়েছিলেন। সেই দিন অপরাহ্ণেই বাড়ী ফিরেছেন।

আমি প্রতিদিনই সন্ধ্যার পূর্ব্বে বেড়াতে যাই। প্রায়ই রাত্রি সাড়ে সাতটা আটটায় বাড়ী ফিরে, আমার পড়বার ঘরে আলো জ্বালি। সেদিন আর বেড়াতে যাই নাই; শরীর তেমন ভাল ছিল না! পড়বার ঘরে একখানি ইজি-চেয়ারে চুপ করে পড়ে আছি; সন্ধ্যা হ'য়ে গেছে, তবুও আলো জ্বালি নাই।

আমি ঘরে নাই মনে করে পাশের ঘরে ব'সে কমল বাবু আর তাঁর মা কথা বল্‌ছিলেন;—আমার সম্বন্ধেই। আমি বেশ শুন্‌তে পেলাম।

কমল বাবু বল্‌লেন, দেখ মা, আমি কাটোয়ার কাজ সেরে মনে ক'র্‌লাম একবার নবদ্বীপ হ'য়ে যাই।

কমল বাবুর মা বল্‌লেন, তুই নবদ্বীপ গিয়েছিলি না কি? হঠাৎ নবদ্বীপ যাওয়ার মতলব মাথায় গেল কেন?

কমল বাবু বল্‌লেন, প্রেমের মায়ের টাকা যে আড়তে জমা আছে, সেই আড়ত যাঁর, তিনি এখন নবদ্বীপে বাস করছেন। জোড়াবাগানে সেই আড়তে গিয়ে ত কোন খবরই পাইনি। তাই মনে কর্‌লাম, একবার সেই বুড়া ঘনশ্যাম নন্দীর সঙ্গে দেখা ক'রে যাই। তাঁরই হাতে টাকটা জমা দেওয়া হ'য়েছিল কি না। তিনি নিশ্চয়ই কোন খবর দিতে পার্‌বেন।

কমল বাবুর মা হেসে ব'ল্‌লেন, তুই যেমন পাগল। তাঁরা ব্যবসায়ী লোক। কতজনের সঙ্গে তাঁদের কত লেন-দেন; সকল কথা কি তাঁদের মনে থাকে। আর তুই এক বছরের কথা নয়; সতর বছর আগেকার কথা। তা কি তাঁর মনে আছে। তারপর কি হোলো।

কমল বাবু বল্‌লেন, আমি আগে কখন নবদ্বীপে যাইনি, পথঘাটও চিনিনে। অনেক জিজ্ঞাসা-পড়া করে, অনেক ঘুরে তাঁর বাসা পেলাম। বৃদ্ধ-মূর্ত্তি সুন্দর মানুষ মা! আমি পরিচয় দিতেই তিনি একেবারে লাফিয়ে উঠে আমার পায়ের ধূলো নিয়ে বসালেন; বল্‌লেন, বাবার সঙ্গে, দাদামহাশয়ের সঙ্গে তাঁর খুব জানাশুনা ছিল। তাঁরা না কি অনেক সময়ই ওঁর বাড়ীতে পায়ের ধূলো দিতেন, বড়ই কৃপা কর্‌তেন। হঠাৎ আমাকে পেয়ে বুড়া ত আনন্দে অধীর। আমি যখন বল্‌লাম যে, আমি বিশেষ একটা প্রয়োজনে তাঁর কাছে এসেছি, তখন তিনি বল্‌লেন, আরে দাদা, প্রয়োজনের কথা পরে হবে। আগে বিশ্রাম কর, স্নান-আহ্নিক কর। গরিবের কুটীরে যখন পায়ের ধূলো আপনা

হ'তে দিয়েছ, তখন আগে সেবা করি; তারপর প্রয়োজন দেখা যাবে। আগে এই সৌভাগ্য ভোগ করতে দাও ভাই! আমি ত মা; বুড়ার আনন্দ দেখে একেবারে অবাক্ হয়ে গেলাম। কত কথা যে জিজ্ঞাসা করলেন্, তা আর ব'লতে পারি নে। এমন প্রাণখোলা সাধু বৈষ্ণব মা, আমি অতি কমই দেখেছি। একেবারে বালকের মত সদানন্দ। বড়মানুষীর সব চিহ্ন যেন ভদ্রলোক ধুয়ে-মুছে ফেলেছেন। কি বিনয়, কি সেবা-পরায়ণতা! তখন আর কি করি, অসল কথা বল্‌তেই পারলাম না! সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলাম ত একখানি গরদের কাপড়, আর একখানি গামোছা। সঙ্গে যে টাকাগুলো ছিল, তা নন্দী মহাশয়ের হাতে দিয়ে যখন কাপড় আর গামোছা নিয়ে গঙ্গাস্নানে বেরুব, তখন বুড়া বলেন কি, ও কি ভাই, ও কাপড়-গামোছা নিতে হবে না। একটু অপেক্ষা কর, আমি কাপড়-গামোছা আন্‌তে পাঠিয়েছি। কত ভাগ্য-ফলে, সাধনা করে আজ দেখা পেয়েছি, ভাই, আমাকে সেবা করতে দাও। সঙ্গে লোক দেব; স্নান-আহ্নিক শেষ করে, ঠাকুরবাড়ী দর্শন করে ফিরে আস্‌বে।

কি করি, আচ্ছা বিপদে পড়লাম যা হোক। বুড়ার কোন কথার প্রতিবাদ কর্‌তে পারলাম না। ঐ যে পুটুলীতে কতকগুলো কাপড় রয়েছে, তুমি বুঝি মনে করেছ আমি কিনে এনেছি। তা নয় মা, সবই নন্দী মশায়ের দেওয়া। আর ঐ যে সাড়ে তিন শ টাকা পেলে, তোমার জমিদারী থেকে অত টাকা পাই নি

মোটে তিন শো পেয়েছি; বাকী পঞ্চাশ টাকা ঘনশ্যাম নন্দীর প্রণামী। খুব যাত্রা করে বেরিয়েছিলাম!

কমল বাবুর মা হেসে বল্‌লেন, তারপর।

তারপর আর কি? স্বহস্তে পাক ও আহার। বুড়া কি ছাড়ে! নিজে সুমুখে বসে থেকে আমাকে দিয়ে যে কত রাঁধিয়ে নিল, সে আর কি বল্‌ব। তা, তোমার আশীর্ব্বাদে ও-কার্য্যেও আমি এম-এ পাশ,—রান্নায় বড় হটি না। নিজে খুব পেট ভরে খেলাম, নন্দী মশাইকেও প্রসাদ দিলাম;—পাতের প্রসাদ নয় গো! দেখ্‌ছ মা, তোমার লক্ষ্মী ঠাট্টার সুরে হাস্‌ছেন। আচ্ছা, তুমিই বল ত মা, পক্ষপাত-শূন্য হয়ে বল ত, ওঁর চাইতে আমি ভাল রান্না করতে পারিনে?

কমল বাবুর মা বল্‌লেন, এই দেখ, কোথায় নবদ্বীপের কথা, আর কোথায় রান্নার বাহাদুরী নিয়ে নালিশ। তোরা কি চিরদিনই ছেলে-মানুষ থাক্‌বি। তুই এখন আসল কথা বল্। কোন খোঁজ পেলি।

কমল বাবু বল্‌লেন, এই দেখ ত রস-ভঙ্গ হোল। মনে করে-ছিলাম দিল্লী লাহোর ত দেখা অদৃষ্টে হোলো না; যদি বা কার্য্যগতিকে শ্রীধাম নবদ্বীপ দর্শন হোলো, আর পরম বৈষ্ণব নন্দী মহাশয়ের সঙ্গে পরিচয় হোলো; তখন খুব জাঁকালো রকম করে, অনেক বর্ণনা করে, বিপুল শব্দ-বিন্যাস করে, অনুপ্রাস অলঙ্কার দিয়ে একটা ভ্রমণ-বৃত্তান্ত লিখে ফেল্‌ব। তারই তালিম্ তোমাদের কাছে দিচ্ছিলাম। আর

তোমরা সে সব ছেড়ে একেবারে আসল গল্প কথা শুন্‌বার জন্য ব্যস্ত। সেই জন্যই কবি বলেছেন অরসিকে ইত্যাদি ইত্যাদি।"

জনান্তিকে শব্দ হইল, ওরে বাবা! একেবারে মহা কবি!

কমল বাবু বল্‌লেন, শুন্‌লে মা, আমি বুঝি লিখ্‌তে পারিনে?

কমল বাবুর মা বল্‌লেন, ও পাগলীর কথায় তুই কাণ দিস্ কেন? তুই তোর মত করেই বল।

আমি যে কি আনন্দের সঙ্গে এই রহস্যালাপ শুন্‌ছিলাম, তা আর বল্‌তে পারছিনে।

কমল বাবু বল্‌লেন, না, আর বর্ণনা করা হবে না। সোজা কথাই বলি। অমন প্রচুর আহারের পর নিদ্রা। অপরাহ্নে নিদ্রাভঙ্গ। তার পর নন্দী মহাশয়ের কাছে আমার আগমনের উদ্দেশ্য বললাম: বুড়ার সব কথা মনে আছে। তিনি বল্‌লেন, বিষয়-কর্ম্ম উপলক্ষে গ্লাডষ্টোন ওয়ালী কোম্পানীর বড় বাবু হরিশ গাঙ্গুলীর সঙ্গে আমার বিশেষ হৃদ্যতা জন্মেছিল। তিনিই একদিন এসে আমার কাছে ষোল হাজার টাকা রাখেন। বিরাজমোহিনীর নামে জমা করতে বলেন। মাসিক শতকরা আট আনা সুদ স্থির হয়। সুদের টাকা মাসে মাসে দিয়ে আস্‌বার ব্যবস্থা তিনিই করে দিয়ে যান। বলে যান যে, বিধবা মারা গেলে যেন তাঁর ছেলেকে সুদ দেওয়া হয়; আর সে যদি চায়, তা হলে আসল টাকাও তাকে যেন দেওয়া হয়। এর বেশী ত আমি কিছু জানিনে ভাই! হরিশ গাঙ্গুলী বেঁচে আছেন কি না

তাও জানিনে। পটলডাঙ্গায় তাঁর বাড়ী ছিল; এখনও বোধ হয় আছে। তিনি যদি বেঁচে থাকেন, তা হলে তাঁর কাছ থেকে সংবাদ পেতে পারবে। তবে দেখ, আমি আর এখন বিষয়-কর্ম্মের মধ্যে নেই; তবুও নীরদকে বলে পাঠাব, সুদের টাকাটা, আসলেরও যদি কিছু দরকার হয়, তা যেন সে ছেলেটাকে দেয়; নাবালক সাবালক ভাববার দরকার নেই। তার পর আমি যখন বল্‌লাম যে হাইকোর্ট থেকে আমি নাবালকের অভিভাবক হয়েছি, তখন তিনি বল্‌লেন, তা হ'লে ত কথাই নেই। তুমিই সব করতে পারবে। তার পর, সন্ধ্যার সময় অনেক সাধু-সমাগম, সংকীর্ত্তন, রাত্রিবাস; আর আজ ঘরের ছেলের ঘরে আগমন; লাভ পঞ্চাশটা টাকা আর কতকগুলি বস্ত্র!

কমল বাবুর মা বল্‌লেন, তা হলে, যে খোজে গিয়েছিলি, তার আর কিছু হোলো না।

কমল বাবু বল্‌লেন, না, হোলো কৈ! হরিশ গাঙ্গুলী যে নিজে টাকা দেন নাই, তা বেশ বুঝলাম; কারণ প্রেমের মায়ের চিঠির কথা মনে আছে ত! তাঁর ভগিনীপতিই যে টাকা দিয়েছেন, এটা ঠিক কথা। আর সে ভগিনীপতি বড়মানুষ, জমিদার, সব কয়টা পাশ করা, কলকাতার বাইরে বাড়ী। তিনি গ্লাডষ্টোন ওয়ালির বড়বাবু নিশ্চয়ই নন। তবুও মনে করলাম, অনুসন্ধানটা আর বাকী রাখি কেন? তাই রেল থেকে নেমে পটলডাঙ্গায় গিয়ে খুঁজতে-

খুঁজতে হরিশ গাঙ্গুলীর বাড়ী গেলাম। সে বেচারী মরে গিয়েছেন; ছেলেরা আছে। তারা সবাই আমার ছাত্র। তারা টাকার কথা কিছুই বল্‌তে পারল না। শেষে আর কি করি, বাড়ী ফিরে এলাম, কোন সন্ধানই হোল না।

কমল বাবুর মা বল্‌লেন, খোজ করবার কোন দরকারও নেই কমল! কি হবে ওতে। তোমরা ও-সব কথা ভুলে যাও।

এইখানেই কথা শেষ হোলো; আমি সেখান থেকে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে, একটু পরে বাড়ী ফিরে এলাম।

১২

পরদিন বৃহস্পতিবার প্রাতঃকালে আটটার সময় মাষ্টার মহাশয় তেল মাখিতেছিলেন, এমন সময় ডাক-পিয়ন আসিয়া একখানি পত্র দিয়া গেল। আমি নিকটেই দাঁড়াইয়া ছিলাম। তিনি বলিলেন, কার পত্র প্রেম?

আপনার নামেই পত্র।

তুমি পড় ত, শুনি, কে পত্র লিখ্‌ল।

আমি পুরু খাম ছিঁড়িয়া পত্রখানি বাহির করিয়া পড়িলাম—

শ্রীশ্রীহরি

শরণং

৪৩।২ ডি, ল্যান্সডাউন রোড

ভবানীপুর—কলিকাতা

১১ই শ্রাবণ, বুধবার।

পরম শ্রদ্ধাভাজনেষু,

আপনার সহিত আমার সাক্ষাৎ-পরিচয় নাই; কিন্তু আপনার ন্যায় সর্ব্বজন-পরিচিত অধ্যাপকের নাম আমার অজ্ঞাত নহে। আপনি জানেন না, আমি বিশেষ কারণে আপনার নিকট কৃতজ্ঞ। আমি একবার আপনার দর্শনপ্রার্থী। আপনার সময় বহুমূল্য হইলেও আমার এই প্রার্থনা পূর্ণ করিতে হইবে। বিশেষ প্রয়োজন না হইলে আমি আপনাকে বিরক্ত করিতে সাহসী হইতাম না।

আর একটী নিবেদন, আপনি কষ্ট স্বীকার করিয়া আমার বাড়ীতে আগমন করিতে পারিবেন না। ভগবান যদি দিন দেন, তখন আমার

গৃহ আপনার পদ-ধূলিতে পবিত্র হইবে; কিন্তু এ ক্ষেত্রে তাহা হইবে না। আমিই আপনার গৃহে যাইব, এই অনুমতি প্রদান করিবেন। কবে, কোন্ সময় গেলে আপনার সাক্ষাৎলাভ করিতে পারিব, অনুগ্রহপূর্ব্বক জানাইলে কৃতার্থ হইব। যত শীঘ্র হয় সাক্ষাৎ হইলে অনুগৃহীত হইব। আপনাকে বিরক্ত করিলাম এবং পরেও করিতে হইবে, তাহার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। নিবেদনমিতি

গুণমুগ্ধ

শ্রীহিরণ্ময় মুখোপাধ্যায়

পত্র শুনিয়া মাষ্টার মহাশয় বলিলেন, তাই ত হে! এ ভদ্রলোক কে? সাক্ষাৎ-পরিচয় নেই, তা ত লিখেছেন দেখ্ছি। আমার মত গরিব ব্রাহ্মণের কাছে তাঁর যে কি প্রয়োজন, তাও ত বুঝতে পারছি নে। আমি তাঁর কি উপকার করেছি যে, তিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছেন। তার পর আবার 'গুণমুগ্ধ'। গুণের ত অন্ত নেই! যাক্, চিঠিখানা রেখে দেও। ও-বেলা কলেজ থেকে এসে জবাব যা হয় একটা দেওয়া যাবে।

সন্ধ্যার সময় বাড়ী এসেই তিনি আমার কাছ থেকে চিঠিখানা চেয়ে নিলেন; তার পর জবাব লিখে এনে আমার হাতে দিয়ে বললেন,

পড় ত প্রেম। অপরিচিত ভদ্রলোকের কাছে কেমন করে কি ব'লে চিঠি লিখ্‌তে হয়, তা বড় একটা জানিনে। কি লিখতে কি লিখে বসব, আর ভদ্রলোক কি মনে করবেন। লেখা দেখে বোধ হচ্চে লোকটা অতি বিনয়ী, বিদ্বানও বটে। কি জানি বাপু, ভদ্রলোকের আমার সঙ্গে কি গুরুতর দরকার হয়ে পড়ল। পত্রখানা চেঁচিয়ে পড়; শুনি দেখি, ঠিক হোলো কি না।

আমি পত্রখানি পড়লাম—

শ্রদ্ধাভাজনেষু,

সবিনয় নিবেদন, আপনার অনুগ্রহ-পত্র পাইলাম। আপনি যে ভাবে আমাকে পত্র লিখিয়াছেন, তাহাতে আমি বিশেষ লজ্জিত হইয়াছি। আমি অতি সামান্য ব্যক্তি; ছেলে পড়াইয়া জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করি। আমার নিকট পত্র লিখিতে এত সৌজন্য প্রকাশ নিতান্তই অনাবশ্যক বলিয়া মনে হয়; উহাতে আমাকে কুণ্ঠিত করা হয়।

আমার ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তির সহিত আপনার কি যে প্রয়োজন, তাহা একেবারেই বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। আমার পরিচয় জানিবারই বা আপনার সুযোগ হইল কেমন করিয়া, তাহাও আমার

বুদ্ধির অগম্য। সে যাহা হউক, আপনি যখন আমাকে দর্শন দানে কৃতার্থ করিতে চান, তখন আর তাহাতে আমার অমত হইবে কেন? কিন্তু আপনি আমাকে আপনার বাড়ীতে যাইতে নিষেধ করিয়াছেন কেন? আপনি মনে করিয়াছেন, বরাহনগর হইতে ল্যান্সডাউন রোডে যাইতে আমার কষ্ট হইবে। ইহা আপনার মহা ভ্রম। আমি কি শীত, কি বর্ষা, বারমাস প্রতিদিন এই বরাহনগর হইতে বিপন কলেজে পদব্রজে যাতায়াত করিয়া থাকি। তাহাতে আমার কোন কষ্ট হয় না। আমি ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের পুত্র, এ সকল অভ্যাস আমার আছে। আমি বাবু নহি, আমি গরীব ব্রাহ্মণ। আমার এম-এ উপাধি, আর প্রফেসারী চাকরীর কথা শুনিয়াই হয় ত আপনার ঐ প্রকার ধারণা জন্মিয়াছে। সেইজন্য আমাকে আপনার বাড়ীতে যাইতে নিষেধ করিয়া, আপনিই এই দরিদ্রের কুটীরে আসিতে চাহিয়াছেন। এখন আমার কথা শুনিয়া যদি আপনার আদেশ প্রত্যাহার করিয়া আমাকেই যাইতে বলেন, তাহা হইলে ভাল হয়। অন্য দিন আমাকে পূর্ব্বাহ্নে নটার সময়েই কলেজে বাহির হইতে হয়; এবং কার্য্যান্তে কারণে-অকারণে নানাস্থান ঘুরিয়া বাড়ী ফিরিতে কোন দিন সন্ধ্যাও হয়, কোনও দিন দুদণ্ড রাত্রিও হয়; সুতরাং রবিবার দেখিয়া সাক্ষাতের ব্যবস্থা করিলেই আমার পক্ষে সুবিধা হয়। আপনি যদি নিতান্তই আমাকে প্রথমে আপনার গৃহে ‘প্রবেশ-নিষেধ’ করেন; তাহা হইলে এই রবিবারেই এই দরিদ্র ব্রাহ্মণের কুটীরে শুভাগমন করিবেন। আপনার

মানমর্য্যাদার কোন ধারণাই আমার নাই। তবে এই মাত্র বলিতে পারি যে, আপনার অভ্যর্থনায় আমার আগ্রহের অভাব হইবে না; অন্য ত্রুটী যথেষ্ট হইবে, তাহা মার্জ্জনা করিতে হইবে। রবিবারে কোন্ সময়ে আপনার আগমনের সুবিধা হইবে, পূর্ব্বাহ্ণে জানাইলে আমি সাগ্রহে আপনার প্রতীক্ষা করিব। নিবেদন ইতি।

ভবদীয়

শ্রীকমলকৃষ্ণ দেবশর্ম্মা বন্দ্যোপাধ্যায়।

পত্রখানি পড়া শেষ হইলে মাষ্টার মহাশয় বল্লেন, কেমন প্রেম; পত্র লেখা ঠিক হয়েছে ত? ভদ্রতার সীমা অতিক্রম করে নাই ত? আমার বাপু, অমন ভদ্রতা প্রকাশ করে লেখা আসে না। ও সব আমি পারিই না একেবারে। ভাল করে দেখ, বিনয় প্রকাশে ত ত্রুটী হয় নাই। কি যে দিনকাল পড়েছে, সব তাতেই আদব-কায়দা। বাপ রে! হাঁপিয়ে উঠতে হয়েছে এই একখানা চিঠি লিখ্‌তে। তারপর, এখন থেকেই ভাবনা হয়েছে, কি জানি কেমন ভদ্রলোক। বড়মানুষ হ'লেই ত মহা বিপদ। আমার বাপু, বৈঠকখানাও নেই, কোচ-সোফাও নেই। এই খান-দুই ভাঙ্গা চেয়ার, আর উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রাপ্ত ঐ দুইখানা মান্ধাতার আমলের চৌকী। আর দেখ্‌চ ত,

সতরঞ্চিখানার যে নবীন বয়সে কি চেহারা ছিল, তা এখন ঠিক করতে হলে প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌কে ডাক্‌তে হয়। ভদ্রলোক এলে কি যে করব। আমাকে যদি যেতে লেখেন, তা হলেই ভাল হয়, কি বল প্রেম?

আমি বল্‌লাম, তাঁর চিঠির ভাব দেখে বোধ হয়, তিনিই আস্‌বেন, আপনাকে যেতে দেবেন না। আর আপনি ত সব কথা খুলেই লিখেছেন; তখন আর কি?

মাষ্টার মহাশয় বল্‌লেন, রাত্রে আর কাজ নেই, কাল সকালেই চিঠিখানা ডাকে দিও। সকালে ডাকে দিলে সন্ধ্যার সময়েই তিনি পত্র পাবেন; শনিবার সকালে আমাকে খবর পাঠাতে পারবেন।

শুক্রবার সন্ধ্যার পরই একজন লোক আসিয়া পত্রের উত্তর দিয়া গেল। মাষ্টার মহাশয় তখন বাড়ীতে ছিলেন না। পত্রে কি সংবাদ আছে জানতে পারিলাম না। লোকটাকে বললাম, তুমি যাও, তিনি বাড়ীতে এলেই পত্রখানি তাঁর হাতে দেব।

লোকটা বলল, পত্রের জবাব বাবু চান নাই, কিন্তু পত্রখানি যেন তাঁর হাতে পৌঁছে, এই কথা বারবার বলে আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। আমি কি একটু বস্‌ব।

আমি বললাম, কোন দরকার নেই। তোমাকে ত এই রাত্রে অতদূর যেতে হবে; দেরী হলে হয় ত সোয়ারের গাড়ী পাবে না।

লোকটা আশ্বস্ত হইয়া চলিয়া গেল। আমি ভাবতে লাগলাম, ভদ্রলোকের মাষ্টার মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করবার এত আগ্রহ যে,

পত্র পাওয়ামাত্র লোক দিয়ে জবাব পাঠিয়েছেন ; ডাকে চিঠি পাঠালে বিলম্ব হ'তে পারে ; তাও তাঁর সহ্য হয় নাই।

মাষ্টার মহাশয় বাড়ীতে এলেই তাঁকে পত্রখানি দিলাম। তিনি বললেন, পড়।

পত্রখানি ছোট, কিন্তু প্রাণস্পর্শী। ভদ্রলোক লিখেছেন—

সকৃতজ্ঞ নিবেদন,

জীবনে এমন পত্র পাই নাই। এখন বুঝিবেন না, আপনার পত্র আমাকে কি বার্ত্তা আনিয়া দিয়াছে। পত্রে নহে কমল বাবু, সাক্ষাতে হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিব। রবিবার তিনটার সময় যেন দর্শন লাভ করিতে পারি।

চির হতভাগ্য

শ্রীহিরণ্ময়—

১৩

যে লোকটী হিরণ্ময় বাবুর পত্র নিয়ে এসেছিল, তাকে অবশ্য বাবুর কথা আমি কিছু জিজ্ঞাসা করি নাই; সেও সে সম্বন্ধে কোন কথা বলে নাই। কিন্তু তাকে দেখেই বুঝতে পেরেছিলাম যে, সে যাঁর ভৃত্য, তিনি বড়মানুষ। মাষ্টার মহাশয়কেও সে কথা বল্লাম। তিনি বল্লেন, তা হলে দেখ্‌ছি বাহিরের ঘরটা একটু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে রাখ্‌তে হয়; সতরঞ্চখানির উপর একখানা বিছানার চাদরও পেতে দিতে হয়, কি বল প্রেম!

আমি বল্লাম, তার দরকার কি? আমরা যে গরিব মানুষ, আপনার পত্র পড়েই তিনি তা জান্‌তে পেরেছেন। আমি বলি ও-সব কিছুই করে কাজ নেই; আমাদের বসবার যায়গা যেমন আছে তেমনই থাক্।

মাষ্টার মহাশয় বল্লেন, আর কিছু না হোক, একটু জলখাবার, পান তামাকের ব্যবস্থা করে রাখ্‌তে হয়।

আমি বল্লাম, তিনি বড়মানুষ, তিনি কি আর জল খাবেন।

তবে পান দুই একটা খেতে পারেন। তামাকের ব্যবস্থা কিন্তু হয়ে উঠবে না ; ও ভারি বদ্ জিনিস।

মাষ্টার মহাশয় বল্‌লেন, ভদ্রলোকের কি যে কাজ, তা আমি মোটেই ভেবে পাচ্ছিনে। ছেলে পড়াবার জন্য হলে ডেকে পাঠাতেন ; অমন পত্র লিখতেন না। যাক্, রবিবার বিকেলেই সব জান্‌তে পারা যাবে।

রবিবার প্রাতঃকালে মাষ্টার মহাশয় বল্‌লেন, না প্রেম, ঘরখানা একটু ঝেড়ে-ঝুড়ে রাখাই ভাল। আগে যখন সংবাদ দিয়ে ভদ্রলোক আস্‌ছেন, তখন তাঁর অভ্যর্থনার আয়োজন করা খুব উচিত।

তাহাই করা গেল। সমস্ত প্রাতঃকাল বাহিরের ঘরটী পরিষ্কার করিতেই কাটিয়া গেল। সাজসজ্জা কিছুই করা হোলো না ; ফরাসের উপরে মসীমলিন সতরঞ্চিখানি একটা শাদা চাদরে ঢাকিয়া দেওয়া হোলো। দুপুর-বেলা দোকান থেকে সামান্য কিছু জলখাবারও আনা হোলো। মাষ্টার মহাশয় তামাসা করে বল্‌লেন, আরে ভদ্রলোক না খান, এই অভদ্রের সেবাতেই লেগে যাবে, কি বল প্রেম ?

তিনটা বাজবার মিনিট দশেক পূর্ব্বেই একখানি দ্বিতীয় শ্রেণীর ভাড়াটিয়া গাড়ী আমাদের বাড়ীর অনতিদূরে থামল। আমরা মনে করলাম, এ গাড়ীতে বোধ হয় আর কেউ এলেন ; আমরা যাঁর জন্য প্রতীক্ষা করছি তিনি নন। ভদ্রলোকটী গাড়োয়ানের ভাড়া দিয়া ধীরে ধীরে আমাদের বাড়ীর দিকেই আসতে লাগলেন। মাষ্টার মহাশয় ও আমি বাহিরেই দাঁড়াইয়া ছিলাম। ভদ্রলোকটী বারান্দার

দিকে অগ্রসর হইতেই মাষ্টার মহাশয় সিঁড়ি দিয়ে নামতে গেলেন। তাঁহার আর নামতে হল না; ভদ্রলোকটী দৌড়িয়া আসিয়া মাষ্টার মহাশয়ের দুই হাত চেপে ধ'রে বল্লেন, কমল বাবু, আমারই নাম হিরণ্ময় মুখোপাধ্যায়। তাহার পর আমার দিকে একটু চেয়েই তিনি একেবারে বালকের মত কেঁদে উঠে, আমাকে তাঁর বুকের মধ্যে চেপে ধরলেন; একটী কথাও তাঁর মুখ দিয়ে বেরুল না—শুধু কান্না।

আমি একেবারে কেমন হয়ে গেলাম! মাষ্টার মহাশয়ও অবাক্ হয়ে চেয়ে রইলেন; কোন কথাই তিনি বল্‌তে পারলেন না।

কান্নার বেগ একটু সংবরণ করে ভদ্রলোকটী অতি কাতর ভাবে গদ্গদ কণ্ঠে বল্লেন, কমল বাবু, আপনি যে হতভাগ্যের সন্ধান করে ফিরছিলেন, আমিই সেই, আমিই—

তাঁকে আর কথা বল্‌তে হোলো না—আমার মাষ্টার মহাশয় তাঁকে দৃঢ় আলিঙ্গন করে চেঁচিয়ে বলে উঠ্‌লেন, আর শুন্‌তে চাইনে হিরণ্ময় বাবু! বাবা প্রেম, প্রণাম কর এঁকে!

আমি প্রণাম কর্‌তে উদ্যত হ'লে তিনি বলে উঠলেন, ওরে প্রণাম নয়—প্রণাম নয়। সতর বৎসরের আশা আজ মিটিয়ে নিই বাবা! তিনি আর আমাকে কোলের মধ্যে নিতে পারলেন না; অবসন্ন ভাবে মাটীতে বসে পড়্‌লেন, তাঁর যেন মূর্চ্ছা হবার মত হোলো।

মাষ্টার মহাশয় তাড়াতাড়ি তাঁকে ধরে ফরাসের উপর শুইয়ে দিয়ে

আমাকে বল্‌লেন, প্রেম, দৌড়ে একখানা পাখা নিয়ে এস, আর মাকে খবর দেও, তাঁকে শীগ্‌গির ডেকে আন।

আমাকে আর ডাক্‌তে যেতে হোলো না; ঠাকুর-মা দুয়ারের পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলেন, মাও ছিলেন। ঠাকুর-মা তাড়াতাড়ি এসে হিরণ্ময় বাবুর মস্তক কোলের উপর তুলে নিয়ে বল্‌লেন, বাবা, অমন করছ কেন? ওরে কমল, মুখে একটু জলের ছাট দে। প্রেম, মাথাটায় বাতাস কর। অমন করছ কেন বাবা! অধীর হোয়ো না; একটু শুয়ে থাক। আহা! দুর্ব্বল শরীর!

মুখে-চোখে জল দিতে এবং হাওয়া করতে তিনি একটু সুস্থ হলেন; অতি ধীরে বললেন, আমার শরীর বড় দুর্ব্বল, তাই একটু অবসন্ন হয়ে পড়েছিলাম। আপনাদের আর কষ্ট করতে হবে না।

ঠাকুর-মা বল্‌লেন, কষ্ট কি বাবা! তুমি ব্যাকুল হোয়ো না। আয় প্রেম, ওর কোলের কাছে বোস্।

আমি কি করব; তাঁর কোলের কাছে গিয়ে বস্‌লাম। তিনি ডান হাত দিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরে বল্‌লেন, মাগো, আজ এই সতর বৎসর যে কি কষ্ট পেয়েছি, তা কেমন করে বল্‌ব। আপনারা জানেন না, আমি—

ঠাকুর-মা বল্‌লেন, তোমাকে কিছু বল্‌তে হবে না বাবা! আমরা সব জানি।

সব জানেন? না মা, জানেন না, জানেন না! কি করে আমার যাতনার কথা জান্‌বেন?

ঠাকুর-মা অতি কোমল স্বরে বল্‌লেন, বাবা, তোমাকে দেখিও নি কখন, জানিও নি; কিন্তু পাঁচ মিনিটেই যে তোমাকে আমরা ভাল করে চিনে ফেলেছি; তোমার মুখে যে বহুদিনের যাতনা ফুটে বেরুচ্ছে বাবা! আর কেউ বুঝতে না পারে, আমি যে মা! সন্তানের বেদনা মা ছাড়া আর কেউ কি বুঝতে পারে বাবা! এই বলিয়া তিনি—কি বল্‌ব—আমার জন্মদাতার মাথায় হাত বুলাতে লাগলেন।

১৪

এইবার আমি তাঁর দিকে চেয়ে দেখলাম। কি সৌম্য মূর্ত্তি! কি শীর্ণ দেহ! মুখখানি অতি মলিন হোলে কি হয়, তারই ভিতর দিয়ে যেন প্রতিভা ফুটে বেরুচ্ছে!

মাষ্টার মহাশয় বল্‌লেন, হিরণ বাবু, আপনার কোন সন্ধানই পাই নাই; কিন্তু প্রেমের মা মর্‌বার পূর্ব্বে তাঁর জীবনের সব কথা লিখে রেখে গিয়েছিলেন; সব লিখেছেন, সুধু কারও নাম-ধাম্ বা কোন পরিচয় দেন নাই। সে চিঠি আমি পড়েছি, আমার মা পড়েছেন। প্রেমের তখন আর আপনার বলবার কেউ ছিল না। আমি তার শিক্ষক; আমিই অনাথ বালককে কোলে তুলে নিয়েছি; আমারই দারিদ্র্যের অংশ তাকে দিয়েছি। তবে আপনার অনুসন্ধানে যে নিযুক্ত হয়েছিলাম, সে কৌতূহলের বশবর্ত্তী হয়ে নয়, অথবা প্রেমকে আপনার হাতে দেবার জন্যও নয়। আমি তার অভিভাবক। সে গচ্ছিত টাকা বা সুদ নেবে না, বা ভৈরব চাটুর্য্যের গলির বাড়ীতেও থাক্‌বে না, এই তার দৃঢ়সঙ্কল্প। কাজেই, আমার কর্ত্তব্য মনে হোলো যে, আড়তে

টাকা পড়ে থাকে কেন, আর আমার হাতেই বা বাড়ী-ভাড়ার টাকা থাকে কেন? যিনি এই সব ব্যবস্থা করেছিলেন, তাঁকে সব ফিরিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হব। তারই জন্য আমি যেখানে যেখানে যেতে হয়, গিয়েছিলাম। সে অপরাধ আপনি ক্ষমা করবেন।

হিরণ্ময় বাবু তখন একটু সামলে নিয়ে উঠে বসেছেন। তিনি মাষ্টার মহাশয়ের হাত দুখানি চেপে ধরে বল্‌লেন, কমল বাবু, অমন কথা বল্‌বেন না। আমি মহাপাপী, আমি বড়ই হতভাগ্য। আমার শাস্তিও আরম্ভ হয়েছে। আমি যে কি কষ্ট, কি যন্ত্রণা পেয়েছি, তা শুন্‌লে আপনিও হয় ত আমাকে দয়া করবেন।

ঠাকুর-মা বললেন, না, বাবা, তোমার আর কিছু বলে কাজ নেই; তুমি একটু বিশ্রাম কর, কথা বোলো না।

হিরণ্ময় বাবু বল্‌লেন, না, না, কথা বল্‌তে আমার কষ্ট হবে না; আমি এখন সুস্থ হয়েছি। আপনারা ত সবই জানেন, আমার কথাটাই জানেন না। তাই একটু বলি। আমি তাঁর কাছে প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ হয়েছিলাম যে, কোনদিন তাঁর সংস্পর্শে আস্‌ব না। আমি এতদিন তা প্রতিপালন করেছি; আমার জীবন দিয়ে তাঁর অনুরোধ পালন করেছি। তিনি কি কিছু নিতে চান? অনেক অনুরোধ করে, অনেক মিনতি করে একখানি বাড়ী, আর সামান্য কিছু টাকা এই সন্তানের বাঁচাবার জন্য তিনি নিতে স্বীকার করেন। তার পর আমি অতি গোপনে সব সংবাদই নিতাম; কিন্তু কোন প্রকার

সাহায্য করবার যো ছিল না—আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলাম। এই সোণারচাঁদকে বুকে ধরবার জন্য আমার যে কি ইচ্ছা হোতো, তা কেমন করে বুঝাব। বাড়ীর কাছে সর্ব্বদা যেতে পারতাম না, যদি তিনি দেখে ফেলেন। কতদিন ঝিয়ের কোলে ওকে দেখে মনে হোতো, ছুটে গিয়ে ওকে কোলে নিই, বুকে ধরি। তা আমি পারিনি। অথচ ঐ বাড়ীর কাছে না গিয়েও পারতাম না। শেষে যখন ও বড় হয়ে হেয়ার স্কুলে পড়তে গেল, তখন আমি আর দেশে থাক্‌তে পারলাম না; এই কলিকাতায় এসে ল্যান্সডাউন রোডে বাড়ী করলাম। সপ্তাহে দুই তিন দিন স্কুলের ছুটীর সময় আমি হেয়ার স্কুলের সম্মুখে গাড়ীতে বসে থাকতাম, ওকেই দেখবার জন্য। ও যখন মলিন বেশে স্কুলের গেট পার হয়ে ফুটপাথে নামত, তখন আমার বুক ফেটে যেত! হায় হতভাগ্য আমি, আমার কিছুই করবার উপায় নেই। আমার কত দাস-দাসী, কত গাড়ী-ঘোড়া, কত বড় বাড়ী; আর 'আমারই প্রেম—তিনি আর কথা কহিতে পারলেন না, তাঁর চক্ষু দিয়া জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। আমরা চুপ করে রইলাম।

একটু পরেই তিনি পুনরায় বল্‌তে লাগ্‌লেন, কমল বাবু, আমাকে আপনারা ক্ষমা করবেন না, আমার প্রতি সহানুভূতিও দেখাবেন না,—আমি তার যোগ্য নই। আমি পাষণ্ড, আমার মান-সম্ভ্রম, আমার জাত্যাভিমান, আমার পদ-মর্য্যাদার কাছে আমার মনুষ্যত্ব বলি দিয়াছিলাম।

বাধা দিয়া মাষ্টার মহাশয় বল্‌লেন, না, আপনি ত তা করেন নাই

হিরণ বাবু! আমি পত্রে দেখেছি, আপনি সব ত্যাগ করে প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন ;—তিনিই তা করতে দেন নাই।

কেন করতে দেন নাই তিনি? কেন তিনি এত কষ্ট, এত দীনতা বরণ করে নিয়েছিলেন? আমার পদমর্য্যাদা, আমার সুনাম, আমার সামাজিক সম্মান রক্ষা করবার জন্য। আমি কেন তাতে স্বীকার হয়েছিলাম? দুর্ব্বল আমি, কাপুরুষ আমি, ধন-মানের কাঙ্গাল আমি—সেই জন্য কমল বাবু! সুধু সেই জন্য! আমার স্ত্রী, আমার একমাত্র পুত্র—তাদের সামাজিক সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য। কিন্তু, এত পাপ সয় না, বিধাতা অন্ধ নন কমল বাবু! তাঁর ন্যায়-দণ্ড কিছুতে টলে না ;—একদিন না একদিন পাপীর মাথায় পড়বেই পড়বে। যাদের জন্য মহাপাপী আমি সাধু সেজে সমাজে রইলাম, যাদের জন্য অভাগিনীকে ত্যাগ করলাম, যাদের জন্য আমার প্রেমকে পথের কাঙ্গাল করে দিলাম, জগতে তার পরিচয় দেবার পর্য্যন্ত পথ রাখলাম না ; কৈ, তারা আজ কোথায়? আট মাস হোলো আমার কুড়ি বছরের ছেলে মারা গেল ; তার দশদিন পরেই ছেলের শোকে তার মা চলে গেল। মান মর্য্যাদা-অভিমানী হিরণ মুখুয্যের পাপের ফল ফলল! দেখলেন কমল বাবু, বিধাতার বিধান! দেখলেন তাঁর ন্যায়-বিচার! তিনি হাঁফাতে লাগলেন।

ঠাকুর-মা বললেন, বাবা, চুপ কর, আর বোলো না ; আমরা সব বুঝেছি। তুমি বিশ্রাম কর, কথা বোলো না।

একটু দম লইয়া আবার তিনি আরম্ভ করলেন, আর বেশী কথা নেই মা, আর বেশী দিন কথা বল্‌বার সামর্থ্যও থাক্‌বে না ; হয় ত এখনই সব শেষ হয়ে যেতে পারে। তার পর শুনুন, আমার পাপের শাস্তির কথা ! আমার ভয়ানক হৃদ্‌পিণ্ডের পীড়া হোলো। অনেক করে প্রাণ বাঁচল। বাঁচবে না ? এত শীঘ্র সব শেষ হয়ে গেলে শাস্তি হোলো কৈ ? ডাক্তারদের পরামর্শে বায়ু-পরিবর্ত্তনে গেলাম। বিশেষ ফলও হোলো। তার পর আর বিদেশে থাক্‌তে পারলাম না। আট মাস যে আমি দূরে থেকে প্রেমের মুখ দেখ্‌তে পাইনি। মন বড় চঞ্চল হোলো। আজ চারদিন হোলো কলিকাতায় এসেছি। এসেই ভৈরব চাটুয্যের গলিতে গিয়ে দেখি বাড়ীতে সব নূতন লোক। পূর্ব্বে কোন দিন সাহস করে বাড়ীর সম্মুখে যাইনি ; সেদিন গেলাম। সেখানে শুন্‌লাম, যাঁর বাড়ী, সেই বিধবা মারা গিয়েছেন ; রিপন কলেজের প্রফেসার কমলকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় নাবালক প্রেমের অভিভাবক হয়েছেন। কমল বাবুই বাড়ী ভাড়া দিয়েছেন ; নাবালকের পক্ষ থেকে তিনিই ভাড়া আদায় করেন। সেখানেই আপনার ঠিকানা পেলাম। তার পর লোক পাঠিয়ে আড়তে খবর নিলাম যে, আপনি সুদের টাকা নেওয়া বন্ধ করেছেন, এবং আমার সন্ধান জানবার জন্য নবদ্বীপে ঘনশ্যাম নন্দীর কাছে গিয়েছিলেন। আমার আত্মীয় হরিশ বাবুর বাড়ীতেও গিয়েছিলেন, এ সংবাদও আমি কাল পেয়েছি। তাই আজ এই সতর বৎসর পরে আমার বুকের

ধনকে বুকে করতে এসেছি। আর কিছু না কমল বাবু, একবার তাকে বুকে ধরব বলে যে বাসনা এতদিন আমাকে যন্ত্রণা দিচ্ছিল, আজ আপনার কৃপায় তা সফল হোলো। তিনি এইবার ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়লেন ; আমি বাতাস দিতে লাগলাম।

ঠাকুর-মা বল্লেন কমল, বাড়ীর ভিতর গিয়ে বৌমাকে বল, শীগ্‌গির একটু সরবৎ করে দেয়। বাছার যে আমার গলা শুকিয়ে গিয়েছে।

তিনি বলিলেন, দণ্ডদাতা ! ভুলি নাই, ভুলি নাই, তুমি দণ্ডদাতা হয়েও দয়াময় ! তাই তুমি মায়ের স্নেহ এমন করে এই হতভাগ্যের উপর বর্ষণ করছ ! যত দণ্ড দিতে হয় দাও, আমার যে তা পাওনা। কিন্তু এই মায়ের স্নেহ যে আমি অনেক দিন পাই নি ; আজ তাই ঢেলে দিয়ে বলছ, ওরে পাপী, আমি দণ্ডদাতাও বটে, দয়াময়ও বটে। এই দয়া, এই মায়ের স্নেহ আমাকে কিছুদিন ভোগ করতে দিও প্রভু !

ঠাকুর-মা বল্লেন, ও কি বল্‌চ বাবা ! তোমার ঐ চোখের জলে সব পাপ যে ধুয়ে গেল হিরণ্ময় ! তোমাকে যে আমি হিরণ্ময়ই দেখ্‌ছি। ছেলের নাম যে সে প্রেমময় রেখে গেছে, সে কথা ভুলো না বাবা !

১৫

আমি তাড়াতাড়ি ভিতরে যেতেই দেখি, মা সরবৎ ও কিছু খাবার নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন ! আমাকে দেখেই বল্লেন, তোমরা সবাই কথা বল্‌তেই ব্যস্ত বাছা, ওঁর যে গলা শুকিয়ে গিয়েছে, এতক্ষণ পরে

তোমাদের তা মনে হোলো। আমি অনেকক্ষণ থেকেই সব নিয়ে এই দুয়ারের আড়ালে দাঁড়িয়ে রইচি।

আমি বল্লাম, মা, আপনি ওখানে গেলেই পারতেন ; ওঁকে ত আর পর ভাবলে চলছে না।

মা বল্লেন, সে কথা ঠিক প্রেম ; তবুও কেমন বাধ-বাধ ঠেক্‌ল।

আমি তখন আর কোন কথা না বলে, তাঁর হাত থেকে সরবৎ ও খাবারের রেকাবী নিয়ে এসে দিদিমার হাতে দিলাম। তিনি বল্লেন, বাবা, একটু সরবৎ মুখে দেও, আর একটু কিছু খাও। শরীর যে তোমায় কেমন করছে, মুখ একেবারে শুকিয়ে গিয়েছে।

হিরণ্ময়বাবুর চোকদুটো ছলছল করে এল ; তিনি বল্লেন, মা, আপনার কথা শুনেই আমার শরীর জুড়িয়ে গিয়েছে। আমার এখন কিছুই খেতে ইচ্ছে করছে না। আর, খাবার ভাবনা কি ? যে ধন আজ আপনারা আমাকে দিলেন, তার কাছে আর সবই তুচ্ছ মা !'

দিদি-মা বল্লেন, সে সব কথা এখন থাক্‌ বাছা ! আমাকে যখন মা বলেছ, তখন মায়ের আদেশ পালন করতে হয়।

তিনি তখন উঠে দিদিমার পায়ের ধূলো নিয়ে বল্লেন, মা, চিনির সরবৎ থেকেও অধিক মিষ্ট, অধিক পবিত্র আর একটা জিনিস আছে, তাই আমাকে একটু দিন, আমার দেহ পবিত্র হয়ে যাক্‌। আমায় আপনি একটু পাদোদক দিন।

দিদিমা বল্লেন, বাবা অমন কথা বোলো না ; অমনিই আশীর্ব্বাদ

করছি, তোমার রোগ সেরে যাক্; তুমি দীর্ঘজীবী হও। এই সরবৎ-টুক খাও বাবা!

হিরণ্ময় বাবু বল্লেন, তাই হোক্। ঐ সরবৎই আমার কাছে আপনার পাদোদক। এই ব'লে তিনি সমস্তখানি সরবৎ এক চুমুকে পান ক'রে যেন একটু সুস্থ বোধ ক'র্‌লেন।

তখন কমলবাবু ব'ল্‌লেন, হিরণবাবু, মার আদেশে সরবৎ খেলেন, এখন ছোট ভাইয়ের আব্‌দারে একটু খাবার মুখে দিন। আমরা গরীব মানুষ, আপনার খাবার উপযুক্ত কিছুই সংগ্রহ করতে পারি নাই। আর আগে কি জান্‌তে পেরেছিলাম যে, আপনি এমন করে এক নূতন দৃশ্যপট তুলবেন। এ খাবারও আনা হোতো না; অনেক ভেবে-চিন্তে সামান্য কিছু এনে রেখেছিলাম।

হিরণ্ময়বাবু ব'ল্‌লেন, কমলবাবু, আপনি আমার শরীরের অবস্থা জানেন না। আমি এই সেদিন মৃত্যুমুখ থেকে বেঁচে এসেছি; আমি ত কোন খাবার খাই না। একবেলা সামান্য দুটো ভাত খাই; তাও অনেক সময় আমার জীর্ণ হয় না; বিকেলে কিছুই খাই না, রাত্রিতে কোন দিন আধপোয়া দুধ, কোন দিন তাও না। এই ক'রে আমি বেচে আছি।

দিদি-মা বল্লেন, না বাবা, তা হ'লে তোমার ও-সব খেয়ে কাজ নেই। এখন এক কাজ কর। উপরের ঘরে বিছানা পাতা আছে; সেইখানে গিয়ে চুপ করে একটু বিশ্রাম কর; সে ঘরটায় বেশ হাওয়া

লাগবে, আর প্রেম তোমার গায়ে-পায়ে হাত বুলিয়ে দেবে। তারপর, সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হ'য়ে গেলে বাড়ী যেও। এখন তোমাকে যেতে দিচ্ছিনে।

আমার কি আর যেতে ইচ্ছে করছে মা! যে দুচার দিন বেঁচে আছি, এখানে কাটালে যে সুখে মর্‌তে পারব। কিন্তু, তা ত পারছি না। একটা বড় জরুরী কাজ আছে। সন্ধ্যার সময়ই আমাকে আমার এটর্ণীর বাড়ী যেতে হবে। তাঁর সঙ্গে বিষয়-আশয় সম্বন্ধে অনেক কথার দরকার আছে। তাঁকে আগেই সংবাদ দিয়ে রেখেছি; তিনি আমার জন্য অপেক্ষা করবেন।

কমলবাবু ব'ল্‌লেন, তা হলে আপনার দণ্ড কর্‌তে চাইনে।

দিদি-মা বল্‌লেন, দণ্ড কি রে কমল?

কমলবাবু বল্‌লেন, তা জান না মা! ঐ যে এটর্ণী নামটা উনি কর্‌লেন, সে যে কি ভয়ানক পদার্থ, তা ত তুমি জান না। আর জান্‌বেই বা কোথা থেকে। গর্ভে ধরেছিলে এই সবেধন নীলমণি!' থাকৃত যদি তোমার আর দুই-একটা ছেলে, আর রেখে যেতেন যদি বাবা দুলাখ পাঁচলাখ, আর পাঁচ-সাতখানা বাড়ী, তা হ'লে এতদিনে জান্‌তে পার্‌তে, এটর্ণী কি বস্তু! এই যে এত মামলা-মোকদ্দমা হয়, এত ভাইয়ে-ভাইয়ে বিবাদ হয়, আর সবাই উচ্ছন্ন যায়, সে মহা-যজ্ঞের পুরোহিত হচ্চেন ঐ এটর্ণী। এটর্ণীর বাড়ী গিয়ে একটা সামান্য কথা জিজ্ঞাসা করলে, যার জবাব একটা 'হুঁ' কি একটা 'না', তা হলেই পরদিন এটর্ণী বাবু কম-পক্ষে ষোল টাকার এক বিল পাঠিয়ে দেবেন।

এই, আজ যদি হিরণ বাবু না যান, তা হ'লে কালই ওঁর হিসেবে লিখে রাখা হবে, বাবুর জন্য দুঘণ্টা অপেক্ষা করবার ফি তিনশ টাকা।

দিদি-মা হেসে বল্লেন, শোনো ছেলের কথা ; ও কখন যে কি বলে, তার ঠিক নেই ; দিনরাত ঐ সব নিয়েই আছে। বেশ গম্ভীর হয়ে থাকৃতে কিছুতেই পারে না বুঝলে বাবা হিরণ্ময়!

হিরণ্ময়বাবু এত কষ্টের মধ্যেও হাসিমুখে বল্লেন, গম্ভীর হবার আশীর্ব্বাদ কর্‌বেন না মা! উনি যেন অমনি হেসে-খেলেই জীবন কাটাতে পারেন। তার বাড়া সুখ, তার বাড়া সার্থকতা মানুষের জীবনে আর কি হতে পারে?

কমলবাবু বল্লেন, শুন্‌লে মা, তুমি ত আমাকে ছেলেমানুষ বলেই উড়িয়ে দেও। এত-বড় এম-এ পাশ, অত-বড় কলেজের অধ্যাপক, মা কিন্তু, বুঝলেন হিরণ্ময়বাবু, আমাকে খোকাই মনে করেন। আর আপনার কাছে বল্‌তে কি, মার দেখাদেখি ওঁর পুত্রবধূটীও আমাকে খোকাই ভাবেন। সে আপনি দুদিন এলেই জান্‌তে পারবেন।

হিরণ্ময়বাবু বল্লেন, মা, আপনাদের দেখে, আপনাদের কথা শুনে যে আমার প্রাণে কি আনন্দ হচ্চে, তা আর কি ব'লে জানাব। আমার এত দুঃখ, এত কষ্ট, এত যন্ত্রণা যে আমি ভুলে যাচ্ছি! এই ত আনন্দময়ীর আনন্দের হাট। হতভাগ্য আমি, এ সুখস্বর্গে প্রবেশের আমার অধিকার নেই। কি অদৃষ্ট করেই এসেছিলাম মা! ধন-সম্পদের অভাব নেই ; লোকে যাকে লেখাপড়া বলে, তাও শিখেছিলাম ;

মান-সম্ভ্রমও হয়েছিল, এখনও আছে ; কিন্তু হৃদয়ের মধ্যে আমার যে কি যন্ত্রণা, একদিনের মোহে কি নরকই আমি বুকে বসিয়েছিলাম,' সে ভোগ জন্ম-জন্মান্তরেও যাবে না। অপরাধ কি কম করেছি, ছিঃ ছিঃ মনে হ'লেও আমার নিজের উপর ধিক্কার জন্মে। আর তার পর—

তাঁর কথায় বাধা দিয়ে কমলবাবু বল্‌লেন, তারপর আমাদের সৌভাগ্যক্রমে আধ ঘণ্টার মধ্যে আমার দাদার আসন চিরস্থায়ীরূপে অধিকার করে বস্‌লেন, আর আমি নিশ্চিন্ত হলাম। জানেন হিরণ-বাবু. কি গুরুতর দায়িত্ব আমি মাথায় করে নিয়েছিলাম। একটী ছেলেকে মানুষের মত মানুষ করা কি সোজা দায়িত্ব। ও জিনিসটা আমি খুব বুঝি। এই যে কলেজে ছেলে পড়াই, আপনি মনে করছেন, সে ভারি দায়িত্ব। রাধামাধব, কিচ্ছু না—একেবারে কিচ্ছু না। দায়িত্ব-বোধ থাক্‌লে মাষ্টারী করতাম না। আমার কথা ত বল্‌তে পারি, শিক্ষকতা মোটেই করিনে ; ছেলে পড়াই, নজর রাখি কিসে তারা পাশ হবে। ওদিকে তারা মানুষই হোক, আর নরপিশাচই হোক, সেদিকে চেয়েও দেখিনে। এমনই কর্ত্তব্যপরায়ণ আমরা! ছেলেদের অনেকের নামই জানিনে, তাদের খবর নেওয়া ত বহু দূরের কথা। কিন্তু যেদিন থেকে প্রেমকে পেলাম, সেইদিন থেকেই বুঝতে পারলাম, ছেলে মানুষ করা কি দায়িত্বের কাজ। যাক্, এখন আপনার ধন আপনাকে দিয়ে আমি শ্রীকমলকৃষ্ণ দেবশর্ম্মা একেবারে খালাস। এ কি কর্ম্মভোগ বাপু! রেতের বেলায় এক-একবার উঠে এসে গায়ে

হাত দিয়ে দেখেছি, প্রেমের ত গা গরম হয়নি। খাবার সময় লক্ষ্য করি, ওর পেট ভরল কি না; পড়বার সময় কাণ দিয়ে শুনি ও সুধু পড়ছে, না সত্যসত্যই শিক্ষালাভ করছে। এই সব ভেবেই মা দুর্গা এতদিন দয়া করে আমাকে ও-বিপদে ফেলেন নি। আমিও বেশ ছিলাম, বুঝলেন। কিন্তু ঐ যে দেখছেন আমার মা, উনি ঊনকোটী দেবতার কাছে আমার পায়ে শিকল জড়াবার জন্য প্রার্থনা করতেন। ব্রাহ্মণ-কন্যার প্রার্থনা ত একেবারে নিষ্ফল হয় না—এ কলিকালেও হয় না; তাই মা দুর্গা একেবারে এই সতর বছরের সোনারচাঁদ ছেলে এনে আমার কোলে বসিয়ে দিয়ে বল্লেন, দেখ্ মজা।

দিদি-মা বল্‌লেন, ওরে কমল, চুপ কর—এ গৃহস্থের বাড়ী, তোর কলেজ নয়; তুই যে বক্তৃতা জুড়ে দিলি।

হিরণ্ময়বাবু বল্‌লেন, বক্তৃতা নয় মা, প্রাণের কথা—দেববাণী। এমন কথা মানুষের মুখে কখন শুনিনি। ভাই কমল বাবু, যে দায়িত্ব আপনি মা দুর্গার কৃপায় স্কন্ধে তুলে নিয়েছেন,তা থেকে কেউ আপনাকে রেহাই দিতে পারবে না।

দিদি-মা বল্‌লেন, আমরাই কি আর প্রেমকে ছেড়ে দিতে পারি? এই ক'দিনই বা এসেছে, এরই মধ্যে সকলের নয়নের মণি হয়ে পড়েছে। কমল যে অমন সব-ভোলা, ওকেও ঐ দাদা আমার এমন করে বেঁধেছে যে, যতক্ষণ বাড়ীতে থাকবে, ততক্ষণ প্রেমের এ হোলো না; প্রেমের ও হোল না—এই নিয়েই আছে। আমার ত এক-এক

সময় মনে হয়, কমল হয় ত একাগ্র ভাবে সন্ধ্যা-গায়ত্রীও জপ করতে পারে না।

কমল বাবু বল্‌লেন, যা বলেছ মা! এ বেটা সত্যিই যাদুকরের অংশে উৎপন্ন। আর তা ত দেখ্‌তেই পাওয়া যাচ্ছে;—কোথাকার কে ভদ্রলোক, একটা জরুরী কাজের জন্য মহানুভব শ্রীযুক্ত কমলকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দর্শনপ্রার্থী হয়ে এসে, এই ঘণ্টা-খানেকের মধ্যে আমার মা, আমার স্ত্রী, আমার বাড়ী-ঘর থেকে আমাকে এক রকম বেদখল করে দিলেন; আর আমি নিতান্ত সুশীল ও সুবোধ বালকের মত, বিনা নালিশে, আমার পিতৃপিতামহ হইতে প্রাপ্ত, উত্তরাধিকার-সূত্রে স্বত্ববান ও দখলীকার আমার সমস্ত দাবী-দাওয়া সুস্থ শরীরে, বহাল তবিয়তে ছেড়ে দিলাম। এতে কি যাদু-মন্ত্রের প্রভাব দেখ্‌তে পাচ্ছ না মা! এই প্রেমটা যাদুকরের বেটা যাদুকর। শুন্‌লে আশ্চর্য্য হবেন হিরণবাবু, আমার ঐ যে গৃহিণী কবাটের আড়ালে দাঁড়িয়ে আছেন, ওঁর গুণের কথা। এতকাল বাড়ীতে ভাল যা কিছু আস্‌ত, তার সিংহের অংশ অর্থাৎ কি না Lion's share আমি ভোগ করে এসেছি। এখন আর তা হবার যো নেই। 'না, গো, না,—এটা আমার প্রেমের জন্য থাক্‌'—এই রকম একটা বিপর্য্যয়—যাকে সাধু রাজভাষায় বলে revolution—তাই এ বেটা এই অল্প কয়দিনের মধ্যে ঘটিয়ে ফেলেছে। আবার মজার কথা শুনুন, ছেলেটার ভাব কিন্তু একেবারে উল্‌টো। জান্‌লেন; হাট-বাজার

আমিই করতাম ; উনি সে অধিকার থেকে আমাকে বঞ্চিত করেছেন। 'তা না হয় কর্ বাপু। কিন্তু, বাজারে নূতন কোন ফল, কি ভাল জিনিস দেখ্‌লেই কিনে এনে প্রথমেই খবরদারী করা হয়—'মা, এটা কিন্তু বাবুর জন্য, আর কাউকে কিন্তু দিতে পারবেন না।' আমার গৃহিণীও বড় কম যান না। তিনি বলেন 'সোনার টোপর মাথায় দিয়ে লুকিয়ে ছিলে কোন্ বনে ও আমার সোনারচাঁদ! বাবুর জন্য দরদ দেখ।' আছি বেশ সুখে হিরণবাবু, বেশ সুখে আছি। তিনশো মুদ্রা বেতন পাই ;—বাড়ীর ভাত খেয়ে তিন-শো টাকা আমার মত এম-এ পাশের পক্ষে বহুত, কি বলেন হিরণবাবু।

হিরণ্ময়বাবু বল্‌লেন, আছেন যে সুখে, তার আর কোন সন্দেহ নেই ; কিন্তু, আপনার মত মানুষের পারিশ্রমিক যে মাসে তিন-শো টাকাই বহুত, এ কথা মান্‌তে পারলাম না কমলবাবু! তিন হাজারও খুব কম বলে আমার মনে হয়।

কমলবাবু বল্‌লেন, তিন কুড়ি কি তিনশো, আপনার মত বড়-মানুষের কাছে কম বই কি,—আপনাদের হাজার লাখ নিয়ে কারবার। কিন্তু আমার মনে হয়, আমার পক্ষে তিন-শো খুব বেশী। পাঁচ কুড়িতে একশ, তারই তিনগুণ ;—টাকাটা নিতান্ত কম নয়—বিশেষ আমার যখন ধার-কর্জ্জ নেই—আর বাবুগিরি—তা ত দেখ্‌তেই পাচ্ছেন।

দিদি-মা বল্‌লেন, এখন ও-সব কথা থাক। বাবা হিরণ্ময়, এখন কি কর্ত্তব্য স্থির করেছ?

হিরণ্ময়বাবু বল্‌লেন, সে কথা আজ থাক মা! কা'ল আমি এসে সব ঠিক করব। কমলবাবু, আমি এখন আসি; কা'ল আস্‌তে বোধ হয় বিকেল কি সন্ধ্যা হয়ে যাবে; হাইকোর্টে বিশেষ একটা কাজ আছে, সেটা শেষ হতে চারটে পাঁচটা বেজে যাবে। সেখান থেকে সোজা এখানে আসব। ঠিক বল্‌তে পারিনে, তবে বোধ হয় আরও দুই একজন বন্ধু আমার সঙ্গে আস্‌তে পারেন। তাই ব'লে আপনি ভোজের আয়োজন করবেন না। কলেজ থেকে পাঁচটার মধ্যেই বাড়ীতে আস্‌বেন। আমি তা হ'লে এখন আসি মা!

কমলবাবু বল্‌লেন, আসি বল্‌লেই ত হবে না! এ আপনার কলিকাতা নয় যে পথে বেরুলেই গাড়ী পাওয়া যাবে—এ বরাহনগর। আপনি একটু বসুন, প্রেম গাড়ী ডেকে আনুক। কোথায় যেতে হবে?

হিরণ্ময়বাবু বল্‌লেন, কলিকাতায় গ্রে ষ্ট্রীটের মোড়ে ছেড়ে দিতে হবে। তারপর এটর্ণীর বাড়ীর কাজকর্ম্ম সেরে, সেখান থেকে যা হয় করা যাবে।

কমলবাবুর আদেশমত আমি গাড়ী ডেকে আন্‌লাম। হিরণ্ময়বাবু দিদিমাকে প্রণাম করলেন; তারপর আগে কমলবাবুকে, শেষে আমাকে কোলে জড়িয়ে ধরে বল্‌লেন, কাল এই সময় আস্‌ছি। এই বলে তিনি গাড়ীতে উঠ্‌লেন।

গাড়ী যখন ছেড়ে দেবে, তখন কমলবাবু বল্‌লেন, দেখুন, কা'ল ভাড়াটে গাড়ীতে এলে বাড়ীতে প্রবেশ-নিষেধ। ঘরের গাড়ীতে আস্‌বেন।

হিরণ্ময়বাবু হাসিমুখে বল্‌লেন, যো হুকুম!

১৬

হিরণ্ময়বাবু চলে গেলে কমলবাবু ঘরের মধ্যে এসে বললেন, তা হলে এখন কি করা যায়?

দিদি-মা বললেন, কিসের কি করা যায়?

কমলবাবু বললেন, এই প্রেমকে নিয়ে। হিরণ্ময়বাবু ত কোন কথাই ভাঙ্গলেন না। তাঁর অভিপ্রায় কি, তা মোটেই বুঝতে পারা গেল না।

দিদি-মা বললেন, কিছু একটা মনে স্থির না করে উনি আসেননি।

কমলবাবু বললেন, কি যে উনি করতে পারেন, আমি ত মা, ভেবে উঠতে পারছিনে। তবে মানুষটী খুব ভাল। একদিনের মোহে যাই করে থাকুন না কেন, হিরণবাবুর হৃদয় খুব উচ্চ, মনও বড় নরম। ভদ্রলোক সত্যসত্যই এতদিন বড় কষ্ট, বড় যন্ত্রণা পেয়েছেন। উনি যখন কথাগুলো বলছিলেন, আমার তখন কান্না পাচ্ছিল। আমি কিন্তু মা, তখনই ওঁর অপরাধের কথা ভুলে গিয়েছিলাম। দেখ মা, আমরা যখন মানুষের সম্বন্ধে বিচার করতে বসি, তখন প্রায়ই ভুলে যাই যে, মানুষ মানুষই—দেবতা নয়। মানুষের ত্রুটী-বিচ্যুতি হওয়া স্বাভাবিক। যাঁদের তা হয় না, তাঁরা মানুষের উপরে। তেমন কয়-

জনই বা দেখ্‌তে পাওয়া যায়। তাই ভেবেই হিরণবাবুর সকল দোষ সকল ক্রটী আমি মনেই আনতে পারলাম না। আর দেখ, ভদ্রলোক সে পাপের ফল কি কম ভোগ করেছেন? আমার ত মনে হয়, ওঁর উপর কোনপ্রকার বিদ্বেষ কারও মনে পোষণ করা উচিত নয়। ওঁর মুখ দেখলে ওঁর অন্তরের গভীর যন্ত্রণা বেশ বুঝতে পারা যায়। আরও দেখ মা, লোকটা কি হতভাগ্য! যে স্ত্রী-পুত্রের জন্য ব্যাকুল হয়েছিলেন, তারা চলে গেল। কি কষ্ট ভদ্রলোকের!

দিদিমা বল্‌লেন, সে আমি সব বুঝতে পেরেছি কমল! কিন্তু, আমিও ভেবে পাচ্ছিনে, উনি এখন কি করতে পারেন?

কমলবাবু আমার দিকে চেয়ে বল্‌লেন, প্রেম, এই যে এত ব্যাপার হয়ে গেল, তুমি একটা কথাও ত বল্‌লে না। তোমার কি মত?

আমি উত্তর দেওয়ার পূর্ব্বেই দুয়ারের ও-পাশ থেকে মা আমাকে ডাক্‌লেন।

আমি তাঁর কাছে যেতেই তিনি বল্‌লেন, প্রেম, দেখ, আমাদের ছেড়ে তুমি যেতেই পার না, এ কথা আর বল্‌তে হবে না। কিন্তু, সাবধান, হিরণ্ময়বাবু যাতে মনে কষ্ট পান, এমন কথা তোমরা কেউ বল্‌তে পারবে না, এ কথা আমি বলে দিচ্ছি। আচ্ছা, তাঁর মুখের দিকে আমি যতবার কবাটের আড়াল থেকে চেয়েছি, ততবারই আমার চোখ জলে ভরে এসেছিল। উনি বড় দুঃখী প্রেম, উনি বড় দুঃখী! ওঁর কথা মনে হলেই আমার বুক ফেটে যায়। এই অসুস্থ শরীর;—

মা নেই, স্ত্রী নেই, পুত্র নেই ; সকলকে যমের মুখে তুলে দিয়ে কি কষ্টে যে উনি জীবনধারণ করছেন, সে কথাটা একবার ভেবে দেখে কথা বোলো। উনি যদি চান যে, তুমি ওঁর সেবা কর, তুমি সর্ব্বদা ওঁর কাছে থাক, তা'হলে কি তুমি সে কথা অস্বীকার করতে পারবে ? এমন হৃদয়হীন কি তুমি হ'তে পারবে ? দেখ, ওঁর জীবন শেষ হয়ে এসেছে ; উনি আর বেশী দিন বাচবেন না। এ সময় উনি যা বল্‌বেন, তাই তোমাদের সকলের করতে হবে,—তোমাকে মাথা হেট করে ওঁর আদেশ পালন করতেই হবে।

মা কথাগুলি এমন স্বরে বল্‌লেন যে, ঘরের মধ্য থেকে দিদি-মা ও কমলবাবু সব শুনতে পেলেন।

দিদি-মা বল্‌লেন, ঠিক কথা বলেছ বৌ-মা ! কমল, দেখ্‌লি তোতে আর আমার বৌ-মাতে কত তফাৎ। তুই কত হিসেব-কিতেব করছিলি, কত বিবেচনা-বিচার করছিলি,—আর করুণাময়ী মা আমার তার প্রাণের সমবেদনা ঢেলে দিয়ে সব বিচার-বিতর্ক ভাসিয়া নিয়ে গেল। দাদা প্রেম, তোমার মা যে আদেশ কর্‌লেন, তুমি তাই কোরো। তোমার কোন কথা ভাববার প্রয়োজন নেই।

১৭

সোমবার কলেজে যাবার সময় রাস্তায় কমলবাবু আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, প্রেম আজ তোমাদের কটা অবধি ক্লাস আছে?

আমি বল্‌লাম, সাড়ে-তিনটায় আমাদের ছুটী হবে।

কমলবাবু বল্‌লেন, আমার যে আজ দেড়টায় কাজ হয়ে যাবে। দেখ, আজ আর আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করব না; আমি দেড়টার সময়ই বাড়ী আসব। বলা ত যায় না; হয় ত বাড়ীতে গিয়ে দেখ্‌ব তিনি এসে বসে আছেন। তোমার ছুটী হলেই বরাবর বাড়ী যেও; সাবধানে রাস্তা পার হোয়ো, বুঝেছ?

এত কথা বল্‌বার কারণ এই যে, তাঁর বাড়ীতে যাওয়ার পর থেকে প্রত্যহ তাঁর সঙ্গেই আমি কলেজে যাই। তাঁর কাজ যদি আগে শেষ হয়, তা হলে তিনি আমার অপেক্ষায় কলেজে বসে থাকেন; আমার ক্লাশ যদি আগে শেষ হয়, তা হ'লে তাঁর জন্য অপেক্ষা করতে হয়; যেতে-আসতে তাঁর সঙ্গী হতেই হবে, এই তাঁর আদেশ। তাই, তিনি এমন করে আমাকে খবরদারী করলেন।

বাড়ী ফিরতে আমার প্রায় পাঁচটা বেজে গিয়েছিল। তখনও কেহ আসেন নাই; কমলবাবু রাস্তার দিকের বারান্দায় তাঁদের অপেক্ষায় বসে আছেন।

আমি যেতেই তিনি বললেন, প্রেম, তাঁরা এখনও এসে পৌছেন নি। আমি বললাম, তিনি ত আগেই ব'লে গেছেন, হাইকোর্টে তাঁর কি কাজ আছে। কখন কাজ শেষ হবে, তার ত ঠিকানা নেই। সেই জন্যই বিলম্ব হয়ে যাচ্ছে।

কমলবাবু বললেন, তাঁর জন্য ত ব্যস্ত হই নি; তিনি একলা যে আসবেন না, সঙ্গে দুই-এক জন ভদ্রলোক আসবেন। কি জানি, সে ভদ্রলোকেরা আবার কেমন?

আমি বললাম, তাঁরা হয় ত হিরণবাবুর বন্ধু কি আত্মীয় হতে পারেন। তার জন্যই বা ভাবনা কি?

কমলবাবু হেসে বললেন, ভদ্রলোক কথাটা শুনলেই আমার ভাবনা হয়। আমি আদব-কায়দা জানিনে, সেই ভয়। ভদ্রলোকেরা হয় ত কি মনে করবেন, এই আমার ভাবনা।

আর ভাববার সময় হোল না; একখানি প্রকাণ্ড ঘরের গাড়ী আমাদের বাড়ীর সম্মুখে এসে দাঁড়াল। কমলবাবু আর আমি এগিয়ে যেতেই হিরণবাবু গাড়ী থেকে নামলেন; তাঁর পিছনেই পেণ্টালুন-চাপকানপরা চসমা-চোখে একটী বাবু নামলেন। এই ভদ্রলোকটীকে দেখেই কমলবাবু মহা উল্লাসে বলে উঠলেন, আরে রমেন্দ্র যে! তুমি এলে কোথা থেকে?

বাবুটী বললেন, এই ত দেখছ ভাই, গাড়ী থেকে নামছি। হিরণ্ময় বাবুকে উদ্দেশ করে বললেন, আচ্ছা মানুষ আপনি যা হোক্।

বল্লেই পারতেন যে বরাহনগরে প্রফেসর কমল বাঁড়ুয্যের বাড়ী যেতে হবে। তা নয়, বল্‌লেন কি না, 'বরাহনগরে একটী ফ্রেণ্ড আছে, তার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব, চল।' আরে ভাই, কমল যে আমার বহুদিনের ফ্রেণ্ড। আমরা প্রেসিডেন্সিতে ফার্ষ্ট ইয়ার থেকে এম-এ পর্য্যন্ত একসঙ্গে ইয়ারকি দিয়েছি। ওর সুমতি হোলো, ও বি-এল্ না দিয়ে প্রফেসারীতে এল ; আর আমি হাইকোর্টে কড়িকাঠ গণি।

কমলবাবু বল্‌লেন, সে কথা পরে হবে, এখন যদি অধমের গরীব-খানায় এসেছ, তখন ভিতরে এসে বোসো।

হিরণবাবু বল্‌লেন, যাক্, তা হলে আর ভদ্রভাবে পরিচয় করিয়ে দিতে হোলো না।

কমলবাবু বল্‌লেন, রমেন আমার সতীর্থ, সুতরাং আপনার আর পরিচয় করিয়ে দেবার কষ্ট স্বীকার করতে হোলো না। হিরণবাবু, রমেন্দ্র আপনার সতীর্থ নয়, তা আমি হলপ্ করে বল্‌তে পারি। প্রেসিডেন্সি কলেজে আমরা যতগুলি ভূত একসঙ্গে মিলে-ছিলাম, তার মধ্যে আপনি ছিলেন না, এ কথা খুব ঠিক। তা হ'লে আপনার সঙ্গে ওর পরিচয় হোলো কি করে? ও আপনার মক্কেল বুঝি। রমেন, খুব শাঁসালো মক্কেল পেয়েছ ভাই, আচ্ছা করে দুয়িয়ে নিও।

হিরণবাবু বল্‌লেন, তা নয় কমলবাবু, রমেন্দ্র আমার উকিল নয়, ওর সঙ্গে আমার অন্য সম্বন্ধও ছিল। এই কথা বলিতেই তাঁহার মুখ

মলিন হয়ে গেল; তিনি একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। কমলবাবুও আর কিছু বলতে পারলেন না। সকলেই তখন ঘরের মধ্যে এসে ফরাসে বসলেন।

রমেন্দ্রবাবু বল্‌লেন, হিরণবাবু আমার পরমাত্মীয়; উনি আমার ভগিনীপতি। আমাদের দুর্ভাগ্য, সে পরিচয় রক্ষার আর কিছুই রইল না; আমার ভগিনী আর একমাত্র ভাগিনেয় দুইজনেই অকালে চলে গেছে। সবই গেছে ভাই, সুধু স্মৃতিমাত্র আছে। এই ত, প্রায় এক বছর পরে আজ হাইকোর্টে দেখা হোলো। উনিও খোজ নেন না, আমিও নানা কাজে পড়ে যেতে পারিনে। আজ উনি নিজে থেকে আমাকে খুজে নিয়ে তোমার এখানে ধরে নিয়ে এলেন। তা ভালই হোলো, অনেক দিন দেখা হয় না; হিরণবাবুর কল্যাণে লাভটা হয়ে গেল। যাক্, এসে ত পড়া গেছে। এখন হিরণবাবু, খুলে বলুন ত, এত স্থান থাক্‌তে এই ম্যালেরিয়ার খনি বরাহনগরে কমলের বাড়ীতে আমাকে নিয়ে আস্‌বার আপনার এমন কি দরকার পড়েছিল।

হিরণবাবু এ কথার উত্তর দিতে পারলেন না; কি যে বল্‌বেন, তাই তাঁর ঠিক হোলো না; তিনি নীরব রইলেন।

কমলবাবু বুঝতে পারলেন যে, প্রকৃত কথাটা বলা তাঁর পক্ষে কেমন কষ্টকর। আমি কিন্তু, এরই মধ্যে কতবার রমেন্দ্রবাবুর মুখের দিকে চেয়েছিলাম; ও-মুখ যে আমার মায়ের মুখের মত।

কমলবাবুই নীরবতা ভঙ্গ করলেন; বল্‌লেন, ভাই রমেন, একটা গুরুতর কথা তোমাকে বল্‌তে হচ্চে; তুমি তা শুনবার জন্য প্রস্তুত হও। হিরণবাবুর পক্ষে সে কথা বলা অসম্ভব। তিনি যে কেন তোমাকে এখানে নিয়ে এসেছেন, আমি তা বুঝতে পেরেছি। তোমাকে আর সংশয়ের মধ্যে রাখব না। এই বলেই তিনি আমার হাত ধরে এগিয়ে নিয়ে বল্‌লেন, প্রেম, এঁকে প্রণাম কর; ইনি তোমার মামা শ্রীযুক্ত রমেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

রমেন্দ্রবাবু বিস্মিত হয়ে বল্‌লেন, তুমি কি বলছ কমল, আমি ত বুঝতে পারছি নে। এই ছেলেটী আমার ভাগনে, এ তুমি কি পাগলের মত কথা বলছ? এই বলেই তিনি আমার মুখের দিকে চাইলেন; এতক্ষণ আর আমাকে লক্ষ্য করেন নাই। আমার দিকে চেয়ে তিনি যেন দৃষ্টি ফিরাতে পারলেন না; এক দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে রইলেন। আমিও তাঁকে প্রণাম করতে পারলাম না— আমার মা যে পুরুষ মূর্ত্তি নিয়ে আমার সম্মুখে!

কমলবাবু তখন অতি ধীরে বল্‌লেন, ভাই রমেন্দ্র, আমি পাগলের মত কথা বলিনি; প্রকৃত কথা বলেছি। বড়ই কষ্টের কথা, বড়ই শোচনীয় কথা;—কলঙ্কের কথাও বটে।

রমেন্দ্রবাবু আরও বিস্মিত হয়ে বল্‌লেন, ভাই, কথাটা খুলে বল, এ যে এক প্রকাণ্ড প্রহেলিকা। এই বলে তিনি উঠে দাঁড়ালেন।

কমলবাবু বল্‌লেন, তুমি স্থির হয়ে বোসো, আমি ধীরে ধীরে সব

কথা বলছি। আমি সব জানি। এই বলে তিনি একে-একে সমস্ত কথা বললেন। শেষে বললেন, ভাই, কা'ল পর্য্যন্তও আমি কারও নাম জানতাম না। কা'লই হিরণবাবুকে এখানে পেলাম, আর আজ তোমাকে পেলাম। প্রেমকে আমি পুত্ররূপে গ্রহণ করেছি। এমন ছেলে লাখে একটী হয় কি না সন্দেহ। এখন সব কথা ত শুনলে; প্রেম কি এখন তোমাকে প্রণাম করতে পারে না?

রমেন্দ্রবাবু অশ্রুপূর্ণ নয়নে আমাকে তাঁর কোলে টেনে নিলেন; তাঁর স্পর্শে আমি আমার মায়ের স্পর্শ অনুভব করতে লাগলাম।

তিনি আমার মাথায় হাত বুলুতে লাগলেন, তাঁর চোখের জল আমার মাথায় পড়ল; মনে হোলো, আমার মা আমাকে আশীর্ব্বাদ করছেন।

একটু চুপ করে থেকে, রমেন্দ্রবাবু আমাকে ছেড়ে দিয়ে পুনরায় বসলেন; আমি তখন তাঁর পায়ের ধূলো নিলাম। তিনি অতি কাতর স্বরে বললেন, ভাই কমল, ওর দিকে চাইতেই আমার মোহিনীর মুখ মনে পড়ে গেল। সে যে ভাই, আমার বড় আদরের ছোট বোন ছিল। জলে ডুবে মরেছে শুনে আমি দু-দিন নাইনি খাইনি, সুধু কেঁদেছিলাম। সে আরও সতর বছর বেঁচে ছিল, আর আমি কিছুই জানতে পারি নি। কার দোষ দেব? হিরণবাবু, আপনি বড়ই নিষ্ঠুরের মত কাজ করেছিলেন। তার উপর নয়, আমার

উপর। আপনি যদি আমাকে বিশ্বাস করে, সব কথা সে সময়ে জানাতেন, তা হ'লে—তিনি কথাটা শেষ করতে পারলেন না,—তা হ'লে কি করতে পারতেন, তা তিনি ভেবে পেলেন না।

হিরণবাবু এতক্ষণ পরে কথা বল্‌লেন; তা হলে তুমি কিছুই করতে পারতে না ভাই! নিষ্ঠুরতা যথেষ্ট করেছি, পশুর মত কাজ করেছি, নিতান্ত স্বার্থপরের মত কাজ করেছি; কিন্তু তখন তাঁরই অনুরোধে আমাকে এসব ব্যবস্থা করতে হয়েছিল। এ-ছাড়া আর কোন পথই আমার মত মান-সম্ভ্রম, সামাজিক পদমর্য্যাদার কাঙ্গালের ছিল না। তার ফল ত দেখ্‌লে! প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হয়েছে। আমার সে সব মোহ কেটে গেছে। সংসারে আমার কেউ নেই, সমাজের ভয়ই বা কার জন্য করব। তাই কা'ল এখানে আত্ম-প্রকাশ করেছি, আর আজ তোমাকে এখানে নিয়ে এসেছি। এখন বল কি কর্ত্তব্য? তুমি আছ, কমলবাবু আছেন, আর দুয়ারের ওপাশে কমলবাবুর—না, না,—আমার মা আছেন—কমলবাবুর সহধর্ম্মিণী আছেন;—তোমরা সবাই বল, আমার এই সোনারচাঁদ প্রেমময়ের সম্বন্ধে কি করা যায়?

রমেন্দ্রবাবু কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ধীরে ধীরে বল্‌লেন, তাই—ত, কি—করা যায়।

তুমি তা হলে ওকে তোমার ভাগিনেয় বলে গ্রহণ করতে পারবে না? রমেন্দ্রবাবু বল্‌লেন, প্রকাশ্য ভাবে—তাই ত, তা কি ক'রে হবে?

ব্যস্, আর শুনতে চাইনে। কমলবাবু, আপনি প্রেমকে আপনার পালিত পুত্র বলে গ্রহণ করবেন ?

কমলবাবু বল্‌লেন, সে ত আপনার সঙ্গে পরিচয় হবার পূর্ব্বেই করেছি। আমার মায়ের আদেশ আমি মাথা পেতে নিয়েছি। আমাদের কথা ছেড়ে দিন। প্রেমময় আমাদের—আপনাদের সে কেউ নয়।

হিরণবাবু বল্‌লেন, আমি কা'লই তা বুঝতে পেরেছি। তবুও আজ এই শেষ সময়ে একবার জিজ্ঞাসা কর্‌লাম, অপরাধ নেবেন না কমলবাবু। মাকে বল্‌বেন, বৌমাকে বল্‌বেন, তাঁরাও যেন অপরাধ না নেন। আমি কি করব—আমি কি করেছি শুন্‌বেন। আমি কারও মুখের দিকে চাইনি—কারও না। পাপ করেছি—মহা পাপ করেছি—এত-কাল গোপন করেছি ; তার ফল যথেষ্ট পেয়েছি—আরও পাব। কিন্তু, এই শেষ সময়ে আমি স্পষ্ট বাক্যে সমস্ত কথা বলেছি। কা'ল আমি আমার এটর্ণীর বাড়ীতে গিয়ে সমস্ত ঠিক করে ফেলেছি। আমি উইল লিখেছি—আজ সে উইল রেজেষ্টরী করিয়েছি, অনেক ব্যয় করে আজই তা বার করে এনেছি। তাতে আমি সব কথা বলেছি—কিছু গোপন করি নাই ; তোমাদের মুখের দিকেও চাই নাই রমেন্দ্র। তোমাকে শুধু একটি কথা বলি রমেন্দ্র ! তোমার ভগিনী ব্যভিচারিণী নন। তিনিও অপরাধ করেছিলেন, আমিও মহা অপরাধ করেছিলাম। তার ক্ষমা

নেই ;—তার ফল তিনিও ভোগ করেছেন, আমিও করেছি—করছি। কিন্তু,—

আমাকে কোলের মধ্যে জড়িয়ে ধরে বল্‌লেন, কিন্তু, সমাজ যা বলুক, সামাজিক বিধি-ব্যবস্থা যা বলুক, তিনি দ্বিচারিণী ছিলেন না। যার সঙ্গে তাঁর তোমাদের শাস্ত্রমত বিবাহ হয়েছিল, তিনি কোন দিন তার শয্যাভাগিনী হন নাই ;—বিবাহিতা হয়েও তিনি তাঁর কুমারীধর্ম্ম রক্ষা করেছিলেন। তারপর অতি কুক্ষণে এই হতভাগ্য তাঁকে একদিন তাঁর সেই সতীর আসন থেকে একেবারে ধূলায় এনে ফেলেছিল। সেই একদিন! প্রেম তাঁরই সন্তান। প্রেম সত্যসত্যই প্রেমময়।

হিরণবাবু হাঁপাতে লাগ্‌লেন। কমলবাবু বল্‌লেন, চুপ করুন হিরণবাবু, আর কথা বল্‌বেন না ; আপনার কথা বল্‌বার দরকার নেই। কাকে বল্‌ছেন এত কথা ? আমরা সব জানি।

হিরণবাবু একটু হাঁফ ছেড়ে বল্‌লেন, কমলবাবু আর বল্‌বার সময় পাব না। বাপ আমার প্রেমময়, মৃত্যু সময়ে তোর মা তোর কাছে ক্ষমা চেয়েছিলেন ; আমিও আজ তোর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আর ত কিছু করবার আমার উপায় নেই। কমলবাবু, আমি আমার যথাসর্ব্বস্ব—আমার যা কিছু আছে, সব আমি আমার পুত্র প্রেমময়কে লিখে দিয়েছি—কিছুই আমার জন্য রাখিনি—রাখবার দরকার মনে হয় নাই।

পকেটের মধ্য হইতে একখানি দলিল বের করে কমলবাবুর হাতে দিয়ে বল্লেন,—এই সেই দানপত্র।

এত উত্তেজনায় তাঁর দম্ বন্ধ হবার উপক্রম হয়েছিল। তিনি বল্লেন, তোমরা একটু বোস, আমি বাইরে হাওয়ায় যাই। এই বলে তিনি একলাই বাইরে গেলেন। সেই যে গেলেন, আজ পর্য্যন্তও তাঁর উদ্দেশ নেই।

সমাপ্ত